ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়

ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা

AMARBOI.COM

সলিমুল্লাহ খান

জাতীয় সাহিত্য ৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধুপোক

প্রচ্ছদঃ সায়মন জাকারিয়া
নামলিপিঃ যিশু বড়ুয়া

সাহিত্য বিচার • রাজনীতি

১৯৪৭ সালের দেশভাগ যে সমস্ত কারণে ঘটিয়াছিল তাহাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে। দুঃখের মধ্যে, এই পরিণতির পিছনে অপার্থিব প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা আজ পর্যন্ত যথাযথ বিশ্লেষণের সম্মুখীন হয় নাই। 'ভদ্রলোক' মতাদর্শের সমালোচক পরিচয়ে খ্যাতিমান বিদ্বান পার্থসারথি গুপ্ত, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা জয়া চট্টোপাধ্যায় কেহই এই প্রশ্নে উপযুক্ত হস্তক্ষেপ করেন নাই।

'রক্ত' আর 'খুন' বিষয়ক বাদানুবাদের সূত্র ধরিয়া সলিমুল্লাহ খান দেখাইয়াছেন, সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্নে 'ভদ্রলোক' মতাদর্শের অনুসারী রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিণামদর্শী ছিল বলিলে কম বলা হয়। ১৯৪৭ সালে সহি বড় বাংলাদেশের যে ঐতিহাসিক বিভাজন তাহার পিছনে একটা বড় ভূমিকা পালন করিয়াছে ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সলিমুল্লাহ খানের তর্জমায়
পেন্তি সারিকস্কির কাব্যগ্রন্থ
উহারা বাতাসে: কবিতা ১৯৫৮-১৯৮০
প্রকাশক: মধুপোক
মার্চ ২০২১

ফিনিশ কবিতাকার পেন্তি সারিকস্কি (১৯৩৭-১৯৮৩) সাহিত্যে নোবেল খেলাত পান নাই কিন্তু নিজ ভূখণ্ডে কবিতায় নবযুগ প্রবর্তকের সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। এয়ুরোপ মহাদেশ জুড়িয়া তাঁহার খ্যাতি। ইংরেজিসুদ্ধ এয়ুরোপের নানান ভাষায় তাঁহার তর্জমা প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৮৩ সাল নাগাদ তদীয় বন্ধু আনসেলম হলো (১৯৩৪-২০১৩) তাঁহার ডজনখানেক কেতাব ঝাড়িয়া বাছিয়া তিন কুড়ি পাঁচটি কবিতার ইংরেজি তর্জমা করিয়াছিলেন শাদামাটা 'পোয়েমস ১৯৫৮-১৯৮০' নামে। ঐ তর্জমার বাংলা বানাইয়াছেন সলিমুল্লাহ খান।

সারিকস্কির কবিতা আপাতদৃষ্টিতে হৃদয়হীন, নির্মম, আপসহীন। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহতের কবি। শুদ্ধ ভাষায় কিংবা প্রকরণে নহে, অন্বেষণে আর কল্পনাশক্তিতেও আপাদমস্তক 'গণতান্ত্রিক' তাঁহার কবিতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সলিমুল্লাহ খান শিক্ষকবৃত্তি আচরি জীবিকা উপায় করেন। তাঁহার সাম্প্রতিক প্রকাশনার মধ্যে 'উৎসর্গঃ পরিবার প্রজাতি রাষ্ট্র' এবং 'প্রার্থনা'।

তৎকৃত তর্জমার উদাহরণ ফিনিশ কবি পেন্টি সারিকস্কির 'উহারা বাতাসে' এবং জার্মান কবি ডরোথি জুল্লের 'আল্লাহর বাদশাহি'।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় সাহিত্য ৩

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

জাতীয় সাহিত্য গ্রন্থমালা

আহমদ ছফা সঞ্জীবনী
(আগামী প্রকাশনী, ২০১০)

প্রার্থনা
(মধুপোক, ২০১৯)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় সাহিত্য ~ তৃতীয় খণ্ড

ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়

ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা

সলিমুল্লাহ খান

AMARBOI.COM

মধুমিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

প্রকাশক: মধুপোক
বুলবুল নিকুঞ্জ, ৩৪/৪ আহাম্মদবাগ, বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
modhupok@yahoo.com • www.modhupok.com
/ BeeEdited

© সলিমুল্লাহ খান

পরিবেশক: আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে: স্মৃতিকথা'
ও
'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা'
গ্রন্থকার
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
এবং
'নজরুল রচনা-সম্ভার'
ও
'নজরুল-রচনাবলী'
সম্পাদক
আবদুল কাদির
সমীপে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়না

দেখিতে ভারি বিদঘুটে এক লোক ঘরে ঢুকিয়া আয়নায় মুখ দেখা শুরু করিল।

বলিলাম, 'আয়না দেখিলে আপনার মনে কষ্ট হওয়ার কথা, তবু দেখেন কেন?'

বিদঘুটে লোকটি জবাব দিল, 'মহাশয়, ৮৯ সালের অমর নীতিতে বলা আছে, আইনের চোখে সবাই সমান। তো আয়নায় মুখ দেখার হক আমারও আছে। খুশি হই বা বেজার হই সে বিচারের ভার তো আমার, অন্য লোকের নয়।'

সত্যের খাতিরে আমি সত্য কথাই বলিয়াছিলাম, তবে কিনা আইনের চোখে তাহার কথাটাও মিথ্যা ছিল না।

—শার্ল বোদলেয়ার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

প্রবেশিকা (১১)

কৈফিয়ত (১৩)

ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়

ঠাকুরের মাৎস্যন্যায় ৩

ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা: রবীন্দ্রনাথের সাধনা ১৩

নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা ৬৮

জাতির নামে বজ্জাতি ৮০

সংবর্ধনা

কবির অভিভাষণ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৫

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ ॥ কাজী নজরুল ইসলাম ১০৩

বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা ॥ বীরবল ১১৪

আমার কৈফিয়ৎ ॥ কাজী নজরুল ইসলাম ১১৯

রচনা পরিচয় ১২৫

নির্দেশিকা ১২৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবেশিকা

এক যুগের অধিক আগে মৎসম্পাদিত 'জাতীয় সাহিত্য' গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছিল 'আহমদ ছফা সঞ্জীবনী' নামে। তখন তখনই দ্বিতীয় খণ্ডস্বরূপে 'কাজির বিচার' বহির কাজ শুরু হয়। পরে উহার একাংশ লইয়া 'ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়' ছাপার পরিকল্পনা করা হইলে তাহাও কিছুদূর আগাইবার পর থামিয়া যায়। বহু পুরাতন সেই উদ্যোগ আজ ভিন্নরূপে আলোর মুখ দেখিতেছে। পার্থক্যের মধ্যে, দীর্ঘ বিলম্বের কারণে ইহা গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ডে দাঁড়াইল।

বর্তমান গ্রন্থে আছে সলিমুল্লাহ খান রচিত পুরাতন তিনটি সাহিত্য-বিচার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলাম ইহাদের কেন্দ্রে থাকিলেও উপকণ্ঠে কান পাতিলে রাজনীতির সুরটি স্পষ্ট শোনা যায়। এই বইয়ের উছিলায় লেখক যে মুখবন্ধ ও ভূমিকাগোছ রচনা ফাঁদিয়াছেন তাহাও হয়ত নিবন্ধ উপাধির দাবিদার। উপরন্তু সংবর্ধনা আকারে পাওয়া যাইবে রবীন্দ্র-নজরুল বিতর্কের নমুনাস্থানীয় তিনটি প্রবন্ধ আর একটি কবিতা।

এই বইতে সলিমুল্লাহ খানের যত লেখা সবই আগাগোড়া পরিমার্জিত হইয়াছে। তাঁহার প্রায় সব উদ্ধৃতি মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি আমরা। উৎসের ভুলগুলি কোথায় সরবে কোথায় নীরবে সংশোধন করা হইয়াছে। কিছু জায়গায় বন্ধনীযোগে নীরবতা ভঙ্গও করিয়াছি। উদ্দেশ্য মূলের ভ্রান্তি পাঠকের দৃষ্টিগোচর করা। একই উদ্ধৃতিতে বানান আর শৈলীর সমতাবিধান করা হইয়াছে। সংবর্ধিত রচনার ক্ষেত্রেও, বিশেষ পরিবর্তনের আশ্রয় না লইয়া আমরা জোর দিয়াছি অন্তর্গত সমতা প্রতিষ্ঠায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা প্রয়োজন, উদ্ধৃত রচনায় দৃষ্ট দুর্বল কিংবা ভুল বাক্যাদি আমরা পুরাপুরি সবল বা শুদ্ধ করার কোশেস করি নাই। প্রচলিত বানান হইতে ঢের দূরে দাঁড়ান সত্ত্বেও বীরবলরূপী প্রমথ চৌধুরীর সংবর্ধনায় 'কাজী নজর-উল-ইস্‌লাম' এবং হুমায়ুন কবিরের উদ্ধৃতিতে 'জসিমুদ্দিন' ছাপা রাখিয়া দিলাম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় যে পাদটীকা তাহা 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে পাওয়া। আর প্রমথ চৌধুরীর টীকা আমাদের সংযোজন। দুইয়ের ব্যবধান চিনাইবার প্রয়োজনে সংযুক্ত টীকা বন্ধনীমধ্যে স্থাপিত হইল। অন্যদিকে আবদুল কাদিরে যে পত্রিকার নাম 'বাঙ্গলার কথা', সুমিতা চক্রবর্তীতে তাহা 'বাঙ্গালার কথা' রূপে উপস্থিত। নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হাতের কাছে না থাকায় আমরা কাদিরের পথই ধরিলাম।

পরিতাপের বিষয়, নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আহমদ ছফা প্রণীত রচনার মূল নথিটি শেষ মুহূর্তে আমাদের সংগ্রহে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তাই উহা হইতে গৃহীত উদ্ধৃতি মিলাইয়া দেখা কিংবা তাহাদের পৃষ্ঠানির্দেশ সম্ভব হইল না। আশা করি এই অপূর্ণতা সহৃদয় পাঠকের ক্ষমা লাভ করিবে।

'ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়' সম্পাদনায় যাঁহারা আমাদের সহায় তাঁহাদের মধ্যে কামরুল হাসান শোভন, শিবু কুমার শীল, তুষার হাসান মাহমুদ, সৈকত দে, সুরাইয়া জান্নাত, সুমন আরেফিন, আরস্তু লেনিন খান ও মেহেদী হাসান। আমাদের ব্যবসায়ের এই প্রাচীন সাথীদের জানাই নমস্কার। সুদীর্ঘ বিরতির কারণে একান্ত আদিতে যাঁহারা এই কর্মযজ্ঞে জড়িত ছিলেন তাঁহাদের কাহার কাহার নাম নিশ্চয় এখানে বাদ পড়িয়া থাকিবে। আমরা তাঁহাদের সকাশ অগ্রিম ক্ষমা চাহিয়া রাখিলাম।

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলামের নাম আলাদা উল্লেখ না করিলে নতুন 'মাৎস্যন্যায়' হইবে। কারণ তাঁহার ভূমিকা এই গ্রন্থে সহকারী সম্পাদক মর্যাদায় উন্নীত।

আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান

১ ফাল্গুন ১৪২৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৈফিয়ত

বৃহৎ মৎস্যসমূহ ক্ষুদ্র মৎস্যসমূহকে খেয়ে ফেলে—এটা তাদের ধর্ম।

সমাজে যখন অরাজকতা বিরাজ করে, রাজ শাসন বলতে কিছু থাকে না, তখন বলবান লোকেরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোকদের সর্বস্ব বলপূর্বক [দখল] করে নেয়। সবলের অত্যাচারে দুর্বল হয় নিপীড়িত, অত্যাচারিত [আত্মসাৎকৃত] ও সর্বহারা। বলবানদের হাতের মুঠোয় থাকে দুর্বলদের জীবন। যে কোন সময় বলবানরা তা কেড়ে নিতে পারে। সমাজে এরূপ উৎপীড়ন, অত্যাচার, অবিচার চলতে থাকলে তাকে বলা হয় 'মাৎস্যন্যায়'।

বাংলাদেশে একবার এইরূপ মাৎস্যন্যায় দেখা দিয়েছিলো। তখন জনসাধারণ অন্যায় অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে গোপাল নামক একজন বুদ্ধিমান যুবককে রাজা নির্বাচিত করে মাৎস্যন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা পান।

—ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (১৯৮৯: ৪৯-৫০)

'আদমবোমা', 'আহমদ ছফা সঞ্জীবনী' ও 'স্বাধীনতা ব্যবসায়'—পরপর এই তিনটি সংকলন প্রকাশের পর স্থির করিয়াছিলাম 'কাজির বিচার' নামে আরেকটি প্রবন্ধ সংগ্রহ বাহির করিব। নানান অনিবার্য কারণে তাহা আর সম্ভব হয় নাই। এক্ষণে বইটির অংশবিশেষ প্রকাশ পাইতেছে।

একদা আমি কাজী নজরুল ইসলাম লিখিত 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধের টীকাস্বরূপ 'বাঙ্গালাভাষায় রক্তের ব্যবসায়' নামে একটি নিবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহা ২০১১ সালে 'পাক্ষিক অন্যদিন' নামের একটি কাগজে ছাপাও হইয়াছিল। সেই লেখার সহিত ২০১৮ সালে লিখিত 'নজরুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' এবং ২০১৫ সালের হস্তক্ষেপ 'জাতির নামে বজ্জাতি' একত্র করিয়া এই নাদান বইটি বাজারে যাইতেছে। ইহার নাম দাঁড়াইয়াছে 'ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়: ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা'।

এইখানে সংগৃহীত লেখাগুলির অন্তর্গত প্রস্তাব অনুসারে, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ যে সমস্ত কারণে ঘটিয়াছিল তাহাদের পূর্ণ বিকাশ ১৯২০ সালের দশকেই ঘটে। দুঃখের মধ্যে, এই পরিণতির পিছনে অপার্থিব প্রতিভার অধিকারী কবি-চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা কি ছিল তাহা আজ পর্যন্ত যথাযথ বিশ্লেষণ লাভ করে নাই। এমনকি অকুতোভয় ইতিহাসজ্ঞ পার্থসারথি গুপ্ত, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা জয়া চট্টোপাধ্যায় কেহই এই প্রশ্নে উপযুক্ত হস্তক্ষেপ করেন নাই (দ্রষ্টব্য, গুপ্ত ২০০০; বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১; চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৪)। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অবদান—আমার মনে হয়—'ভদ্রলোক' মতাদর্শের অনুসারী। সেই অবদান অপরিণামদর্শী ছিল বলিলে খুব বেশি বলা হয় না।

এই বইয়ের ভূমিকা প্রবন্ধ 'ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়'-যোগে আমি আরো বলিবার চেষ্টা করিয়াছি, ১৯৪৭ সালে খাস বাংলাদেশের যে ঐতিহাসিক বিভাজন ঘটিয়াছিল—যে বিভাজন এখন পর্যন্ত নিরঙ্কুশ ও জনপ্রিয়—সম্ভবত তাহার পিছনে মাৎস্যন্যায়ের মত ঘটনাবলি একটা বড় ভূমিকা পালন করিয়াছে। এখানে আমরা 'মাৎস্যন্যায়' শব্দের কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' অভিধানে তিনি শব্দটির সংজ্ঞা দিয়াছেন এইরূপ: 'বৃহৎ মৎস্য যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস করে সেই নীতি, "জোর যার মুল্লুক তার" নীতি, অরাজকতা' (ওদুদ ও ঘোষ, প্রকাশকাল অজ্ঞাত: ৮৩৭)।

১

এই সংকলনে সংবর্ধনাস্বরূপ কাজী নজরুল ইসলামের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' লেখাটি ছাপা হইতেছে। ইহার প্রথম প্রকাশ সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রিকায়—১৪ পৌষ ১৩৩৪ (মোতাবেক ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৭) তারিখে। ১৯৪৭ সালের পর রচনাটি সম্ভবত প্রথম পুনর্মুদ্রিত হয় আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ডে এবং তারপর 'নজরুল রচনা-সম্ভার' দ্বিতীয় সংস্করণে। আবদুল কাদির জানাইতেছেন, 'আত্মশক্তি'র ফাইল হইতে নকল করিয়া তাঁহার কাছে লেখাটি পাঠাইয়াছিলেন প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় (কাদির ১৯৬৯খ: [পাঁচ])। আমরা অত্র 'নজরুল-রচনাবলী' হইতে লেখাটি নকল করিতেছি।

নজরুলের এই প্রবন্ধের পূর্বাপর একটি ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আবদুল কাদির ১৯৬১ সালে প্রথম সংস্করণ 'নজরুল রচনা-সম্ভার' গ্রন্থের মুখবন্ধযোগে লিখিয়াছিলেন:

> ১৩৩৪ শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রকাশিত হলে তার সমালোচনা ক'রে ভাদ্রের 'বিচিত্রা'য় শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লেখেন 'সাহিত্যধর্মের সীমানা', আশ্বিনের 'বঙ্গবাণী'তে শরৎচন্দ্র লেখেন 'সাহিত্যের রীতিনীতি'। শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদ ক'রে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ১৩ই আশ্বিনের 'আত্মশক্তি'তে লেখেন 'আধুনিক সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র'; তাতে বলেন: 'তিনি (শরৎচন্দ্র) নজরুল-কল্লোল-কালি-কলমের সাহিত্যসৃষ্টিতে আস্থাবান—যাঁহাদের রচনার প্রতি অক্ষরে কৃত্রিমতা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।' অতঃপর রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের 'পরিপূরক' হিসেবে ১৩৩৪ অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে লেখেন 'সাহিত্যে নবত্ব'; তাতে বলেন: 'মোহিতলাল সাধারণের কাছে খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এইজন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তারা-মারা পালোয়ানি নেই। যথার্থ যে বীর, সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জাবোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে; সাহস আছে, বাহাদুরী নেই।' রবীন্দ্রনাথের এ-সব কথার ইঙ্গিত লক্ষ্য ক'রে নজরুল ইসলাম 'আত্মশক্তি'তে লেখেন 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'; তাতে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নাটিকার উৎসর্গকরণ, কবিতায় 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দ ব্যবহার প্রভৃতি বহু বিষয়ের উল্লেখ করেন। অতি-আধুনিক বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যের বিবর্তনে নজরুল নিয়েছিলেন পুরোধার ভূমিকা, এ প্রবন্ধটিতে তার পরিচয় প্রোজ্জ্বল (কাদির ১৯৬৯কঃ [ছয়]-[সাত])।

১৯৬৭ সালে 'নজরুল-রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ডযোগে আবদুল কাদির ঘটনাক্রম আরো একটু পরিষ্কার করিলেন। তাহার সারমর্ম নিম্নরূপঃ ১৯২৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডাকিয়া সংবর্ধনা দেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন রবীন্দ্র-পরিষদ। সংবর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' বিষয়ে যে ভাষণ দেন তাহার বিবরণ প্রকাশিত হয় 'বাঙ্গলার কথা' নামক পত্রিকায় ৪ পৌষ ১৩৩৪ (মোতাবেক ২০ ডিসেম্বর ১৯২৭) তারিখে। দশ দিন পর কাজী নজরুল ইসলাম 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় লিখিলেন 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'। একই পত্রিকায় মাসাধিককাল পর, ২০ মাঘ ১৩৩৪ (মোতাবেক ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮) তারিখে প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরীর রচনা 'বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা' (কাদির ১৯৬৭ঃ ৬৫৭)।

শতবর্ষ আগের এই বিস্মৃত-প্রায় বাদানুবাদ হইতে আজ আমরা কিছু কি শিখিতে পারি? আমার ধারণা পারি। কারণ আমাদের শিক্ষার দ্বার এখনো অবারিত। আমাদের মনে হয়, ভাষা ও সাহিত্যের অপরিসর ক্ষেত্র হইতে কিছু দূরেও সেই শিক্ষাসত্র খোলা যাইতে পারে।

এয়ুরোপ মহাদেশে প্রথম মহাসমর শেষ হইবার পর পরাধীন ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিছু কিছু প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। চাপাইয়া দেয় রাওলাট আইন প্রভৃতি নতুন নতুন নিবর্তনমূলক বিধি ও ব্যবস্থা। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে এই সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে যাঁহারা পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহাদের গুলি করিয়া হত্যা করে ইংরেজ প্রশাসন। পরবর্তী কয়েকদিন ধরিয়া অকথ্য অপমান ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয় শহরের জনসাধারণ।

এদিকে প্রথম মহাসমরে পরাজিত মুসলমান জগতের নামকাওয়াস্তে খলিফার (অর্থাৎ তুর্কি সম্রাটের) কি পরিণতি হইবে তাহাও ব্রিটিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্রাজ্যের অধীন ভারতীয় মুসলমান নেতাদের একাংশের মাথাব্যথার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই উত্তেজনার জের ধরিয়া ভারতজোড়া শুরু হয় জাতীয় আন্দোলনের নবপর্যায়। এই পর্যায়ের অন্যান্য ধ্বনির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ডাকও শোনা গিয়াছিল। প্রকাশ থাকে যে বাংলার হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের যে অংশ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিবিয়ু' সম্পাদক এবং 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আদৌ সমর্থন করেন নাই তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া খেলাফত আন্দোলনের বিরুদ্ধেও দাঁড়াইয়া যান (সেন ১৯৯০: ৪৬৭)।

১৯২২ সালের গোড়ার দিকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিলে খেলাফত আন্দোলনেরও দফারফা হয়। দুই বছর পর, ১৯২৪ সালের শেষদিকে মোস্তফা কামাল তুরস্কে খলিফার পদ বিলুপ্ত করিলে খেলাফত আন্দোলনের পুরাপুরি সমাধি ঘটে। 'ইসলাম-দর্শন' পত্রিকার জনৈক লেখক তখন তখনই বলিয়াছিলেন, 'কলিকাতায় অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম ১৯২০ সালে আর ১৯২৪ সালের অক্টোবর নাগাদ তাহার মৃত্যু ঘটে' (উদ্ধৃত, সেন ১৯৯০: ৪৬৭)। তিনি একটুও ভুল বলেন নাই।

AMARBOI.COM

অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রকোপ দেখা দিলেও 'দেশবন্ধু' নামে খ্যাত চিত্তরঞ্জন দাশ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন পরিস্থিতি কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে ছিল। ১৯২৫ সালের জুন মাস নাগাদ তাঁহার অকাল বিয়োগের পর বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ উত্তরোত্তর বলবান হইতে থাকে।

১৯২৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেসিডেন্সি কলেজে যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা ছাপা হইবার কিছুটা আগেভাগেই যাহাকে বলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উৎপাত তাহা খাস বাংলাদেশের সবখানেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। সরকারি হিশাব অনুসারে, আগের বছর নিখিল বাংলাদেশের চতুঃসীমায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ঘটে মোট এগারটি। ১৯২৬ সালে শুদ্ধ কলিকাতা নগরে গোটা দুই পর্যায়ে—প্রথমে ২ এপ্রিল হইতে ১২ এপ্রিল এবং পরে ২২ এপ্রিল হইতে ৯ মে পর্যন্ত—দাঙ্গা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঙ্গামার অবাধ অনুষ্ঠান চলে। ভারতবর্ষ জুড়িয়া সেদিন পর্যন্ত যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়াছিল, নিহত ও আহতের সংখ্যা বিচারে এইবারের ঘটনা তাহার সব কয়টিকেই ছাড়াইয়া যায় (দত্ত ১৯৯০: ৩৮)।

হিংসায় উন্মত্ত, নতুন উচ্চতায় উপনীত সেই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নিহত ও আহতের হিশাব যথাক্রমে ১১০ ও ৯৭৫ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল বলিয়া নানান বয়ানে উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রিটিশশাসিত ভারতের অন্যান্য শহরেও দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়ে। সরকারি বয়ান অনুসারে, ১৯২৩-১৯২৬ সালের এই দুর্ভাগ্যজনক পর্বে বোম্বে, পাঞ্জাব, দিল্লি, যুক্ত প্রদেশ, বিহার এবং বাংলায় মোট দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ঘটে সব মিলাইয়া ছিয়াত্তরটি। ইহাদের মধ্যে গোটা একতিরিশটি ঘটনা ১৯২৬ সালের ১ জানুয়ারি হইতে ২২ আগস্ট পরিসরে ঘটিয়াছিল (দত্ত ১৯৯০: ৩৮)।

দুঃখের মধ্যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সমস্ত ঘটনাই তখন ঘটিতেছিল তথাকথিত 'জাতি' আর 'জাতীয়তা'র নামে।

AMARBOI.COM

২

ব্রিটিশ ভারতে 'জাতি' বলিতে ঠিক কি বুঝাইবে তাহা ১৯২০ আর ১৯৩০ সালের দশকেও স্থির হয় নাই। ভারতবর্ষও কখনো আধুনিক 'নেশন' অর্থে জাতি হইয়া ওঠে নাই। কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মকথা—'এ নেশন ইন মেকিং' বা 'গড়ার পথে জাতি'—এই সত্যের সাক্ষী (দ্রষ্টব্য, বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৫)। যুক্তিসঙ্গত কারণেই 'সম্প্রদায়' বলিতে কি বোঝায় তাহাও তখন পর্যন্ত পাকাপোক্ত হয় নাই। সেই অনুপস্থিত নিরিখের জেরে এক সম্প্রদায়কে 'সমাজ' আর অন্য সমাজকে 'সম্প্রদায়' বলা তাই একান্ত অর্থহীন হইয়া পড়ে।

আমাদের হাতে ধরা বইয়ে একটা বড় প্রবন্ধের বিষয় 'রক্ত' আর 'খুন' শব্দ দুইটির মধ্যে কোনটি জাতীয় বা 'সামাজিক' আর কোনটি 'সাম্প্রদায়িক' তাহা নির্ণয়। এই বিতর্ক তখন পর্যন্ত অমীমাংসিত অবস্থায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরাজ করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিষ্কার গলায় বলিয়াছিলেন, রক্ত অর্থে খুন শব্দের ব্যবহার সাম্প্রদায়িক আর রক্ত শব্দটাই সর্বজনীন বা সামাজিক। এতদিন পর নিশ্চয় পরিষ্কার হইয়াছে যে ঠাকুরের এই বিচারটা যথার্থ ছিল না; কথাটা তিনি বলিয়াছিলেন নিছক গায়ের জোরে।

১৯২৩ সালের—বিশেষ ১৯২৫ সালের—পর হইতে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্রমাবনতি যেভাবে ঘটিতেছিল তাহাকে ব্যক্তিবিশেষের কীর্তি বলা হয়ত সঠিক নহে, কিন্তু অন্ধ হইলে তো আর প্রলয় বন্ধ থাকে না! ইতিহাসে এমন সময়ও আসে যখন সৎসাহস—অর্থাৎ আহমদ ছফা যাহার সংজ্ঞানির্দেশ করিয়াছিলেন 'অনেক দূরবর্তী সম্ভাবনা যথাযথভাবে দেখিতে পারার ক্ষমতা' তাহা—প্রার্থনার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যবশত, গোধূলিবেলার আলো আর সন্ধ্যারাত্রির আঁধারের সেই সন্ধিক্ষণে একান্ত অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঐ পদার্থ প্রার্থনা করেন নাই।

ইতিহাসবিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ নিরোধের জন্য বাংলাদেশের হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায় স্বদেশি আন্দোলনে নামিয়াছিলেন এবং একপ্রকার সফলকামও হইয়াছিলেন। আবার মাত্র চারি দশকের মাথায়—১৯৪৭ সালে—উঁহারাই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভয়ে গঙ্গার মত 'বঙ্গের দ্বিতীয় বিভাগ' নামের বিয়োগটা ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা, ঘটনার একটি কারণ খুঁজিতে হইবে মুসলমান জনগোষ্ঠীর অচলায়তনে। এমনকি ১৯০৫ সালেও তাহাদের এই অচলায়তনে চিড় ধরে নাই। প্রভেদের মধ্যে, ১৯২০ সালের পর তাঁহারা অনেক বেশি আত্মসচেতন আর খানিকটা সচল হইয়া উঠিতেছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ, বাংলার হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায় ১৯২০ সালের পর ভারতব্যাপী নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া পড়েন। তাঁহাদের পক্ষে মুসলমান কৃষক সমাজ তো দূরের কথা, এমনকি হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য, অধস্তন বা দলিত অংশের নেতৃত্বদানও আর সম্ভবপর ছিল না। ভূস্বামী আর প্রজারা ততদিনে পরস্পর মুখামুখি দাঁড়াইয়া গিয়াছে (চট্টোপাধ্যায় ২০১০)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূস্বামী আর প্রজার বিরোধ হইতেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উৎপত্তি—এমন সরল সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন অনেক প্রতিথযশা ইতিহাসবিদ। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং সুগত বসু আলাদা আলাদা প্রবন্ধে দাবি করিয়াছেন, বিশ শতকের গোড়ায় বাংলাদেশে—বিশেষ পূর্ব বাংলায়—ধনী কৃষক তথা জোতদার শ্রেণির উৎপত্তি ঘটিয়াছিল বলিয়াই মুসলমান সমাজ রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। এই দাবিকেই তাঁহারা 'মুসলমান সমাজের একলা চল' নীতি কিংবা সাম্প্রদায়িকতা নামাঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, এই নীতিরই চরম পরিণতি ১৯৪৭ সালের বিভক্তি। এক কথায় বলিতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসানে বাংলাদেশে দেখা দিল চিরস্থায়ী বিভক্তি (চট্টোপাধ্যায় ২০১২; চট্টোপাধ্যায় ২০১০; বসু ১৯৮৬)।

বাঙালি মুসলমান সমাজে একশ্রেণির অবস্থাপন্ন ছোট জমিদার বা জোতদারের উদ্ভবই 'মুসলমান সমাজের একলা চল' নীতির আঁতুড়ঘর—এই দাবি ১৯৭০ সালের দশকে তুলিয়াছিলেন ইতিহাসকর রজতকান্ত রায় ও রত্নলেখা রায় (দ্রষ্টব্য, রায় ১৯৭৩; রায় ও রায় ১৯৭৫)। তাঁহাদের উত্থাপিত 'জোতদার উপপাদ্য' আজ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের দেশভাগ নাটকের সর্বাধিক প্রচারিত এবং সর্বশেষ জনপ্রিয় ব্যাখ্যা। নিম্নবর্গ গবেষণার পুরোধা পার্থ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত পরিশেষে এই 'জোতদার উপপাদ্যে'র অনুগমন করিয়াছেন। তাঁহার দাবি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস দল এই সন্ধিক্ষণে—বিশেষ ১৯৩০ সালের দশকে—ক্ষুদ্র কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করিতেই অধিক তৎপর হইয়াছিল। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ধরিয়া লইয়াছেন, জোতদারদের বেশির ভাগ মুসলমান আর ক্ষুদ্র কৃষকদের অধিকাংশ হিন্দু সমাজভুক্ত বলিয়া বাংলার কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মুসলমান স্বার্থবিরোধী কর্মনীতি গ্রহণ করে—রাজনীতি পরিগ্রহণ করে সাম্প্রদায়িক রূপ।

যতদূর দেখিতে পারিতেছি, জয়া চট্টোপাধ্যায় এই 'জোতদার উপপাদ্য' গ্রহণ করেন নাই। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তার এবং দেশভাগের দায় তিনি শেষবিচারে হিন্দু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের উপরই চাপাইয়াছেন। একদিকে তিনি দেখাইয়াছেন, বাঙালি মুসলমান সমাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গড়িয়া ওঠা জোতদার বা ধনী কৃষকেরা এক লাফে মুসলিম লীগের পিছনে পৌঁছেন নাই। তাঁহারা যথাক্রমে দাঁড়াইয়াছিলেন (পরকালে শেরে বাংলা নামে খ্যাত) আবুল কাসেম ফজলুল হকের উদ্যোগে গঠিত নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি আর কৃষক প্রজা পার্টির কাতারে। এমনকি ১৯৪৩ সালের উত্তরকালে মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ার পরও তাঁহাদের অধিকাংশের দাবিদাওয়া ছিল একান্তই পার্থিব—অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ। তাঁহাদের প্রধান প্রধান দাবি—জমিদারি উচ্ছেদ, মহাজনি শোষণের অবসান, ফসলে বর্গাচাষির দুই ভাগ—ছিল সাম্প্রদায়িকতার আওতাবহির্ভূত।

জয়া চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন, বিশেষ ১৯৩২ সালের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' আর ১৯৩৪ সালের 'পুনা সন্ধি' বাংলাদেশের হিন্দু মধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোক শ্রেণিকে দেশভাগের পথে ঠেলিয়া দেয়। ভদ্রলোক শ্রেণি আবিষ্কার করেন, তাঁহারা প্রভাবশালী ও সংস্কৃতিবান হইবা সত্ত্বেও নতুন নিয়মের আওতায় পড়িয়া 'সংখ্যালঘু' হইয়া যাইতেছেন। ১৯০৫ সালে যাঁহারা মাতৃভূমির ঐক্য রক্ষার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা প্রয়োজনে বোমা-বারুদের সদ্ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারার পর তাঁহারাই মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদে মুক্তির পথ খুঁজিলেন। মুসলমান সমাজের দাবির মধ্যে কোন যথার্থতার সন্ধান তাঁহারা পাইলেন না। জয়া চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বিশ্লেষণে ভদ্রলোক শ্রেণির অন্তর্গত কয়েকজন সাহিত্যসাধকের ভাবাদর্শও বিচার করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র উদাহরণস্বরূপ লিখিয়াছিলেন, যাহাকে বলে 'সংস্কৃতি' তাহা একমাত্র হিন্দু হইলেই অর্জন করা সম্ভব, অন্যথায় নহে (দ্রষ্টব্য, চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৪)।

আজ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও তাহার আগের কুড়ি-পঁচিশ বছরের রাজনীতি লইয়া যত বিচার-বিশ্লেষণ হইয়াছে তাঁহার মধ্যে জয়া চট্টোপাধ্যায়ের জুড়ি পাওয়া যাইবে না। কোন অজ্ঞাত কারণে তিনিও দেখিতেছি সেকালের শ্রেষ্ঠ কবি ও চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবাদর্শ বিচারের আওতায় আনেন নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্যান্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি প্রতিভাবান তখন ভূস্বামীপক্ষের নিশান হাতেই দাঁড়াইয়াছিলেন। 'বাঙলার কাব্য' নামক সন্দর্ভের লেখক হুমায়ুন কবির ১৯৪০ সালের পর একদিন ঠিকই বলিয়াছিলেনঃ রবীন্দ্রনাথের যাহা কিছু প্রতিভা তাহা স্বদেশি আন্দোলনের যুগেই শেষ হইয়া গিয়াছে; অসহযোগ আন্দোলনের যুগে তিনিও একপ্রকার দিশা হারাইয়াছেন (কবির ২০১৫: ৬৩)। বাংলার বহুলালোচিত রেনেসাঁস যে বঙ্গের দ্বিতীয় বিভাজনেই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল তাহা মোটেও অকারণে নহে।

পক্ষান্তরে, কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ছিল খেলাফত আর অসহযোগ আন্দোলনের ফসল। ১৯৪০ সালের দশকেই হুমায়ুন কবির লিখিয়াছিলেনঃ 'অসহযোগ আন্দোলনের আলোড়ন বাঙলা কাব্যে বোধ হয় নজরুল ইসলামের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী জেগেছিল, এবং সেইজন্যই বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তাঁর এত প্রতিষ্ঠা' (কবির ২০১৫: ৬৩)।

সেই সাম্প্রদায়িক দুর্যোগের যুগেই কাজী নজরুল বিরচিত 'কাণ্ডারী হুশিয়ার!' কবিতাটি সাধারণ্যে জাহির হইয়াছিল। ইহা প্রথমে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সংখ্যায় ছাপা হয়। একটু পরে আশ্বিন সংখ্যা 'কালি-কলম' কাগজে কবির লেখা স্বরলিপিসহ আরো একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯২৬ ইংরেজির ২২ মে তারিখে 'কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মিলনী'—মানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে—স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম গানটি উদ্বোধনী সংগীতস্বরূপ গাহিয়াছিলেন (কাদির ১৯৬৭: ৬৪২)। এই গানে ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ডাক।

খেলাফত যুগের 'মোহর্‌রম' প্রভৃতি কবিতায় তো বটেই, ঐক্যাভিসারী এই 'কাণ্ডারী হুশিয়ার!' কবিতাযোগেও নজরুল ইসলাম 'খুন' শব্দটির প্রয়োগ ঘটাইয়াছিলেন। একাধিকবার ঘটাইয়াছিলেন। প্রশ্ন জাগিবে, প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি এই প্রয়োগেরই প্রতিবাদ জানাইতেছিলেন? উত্তরটা হ্যাঁ হইলে বিশ্বাস করিতে বড়ই কষ্ট হয়। স্বীকার করিতে দোষ নাই, 'সৎসাহস' দেখাইয়াছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ইসলাম—অর্থাৎ তিনি 'অনেক দূরবর্তী সম্ভাবনা যথাযথভাবে' দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি গাহিয়াছিলেনঃ

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

(ইসলাম ১৯৬৭: ৩৭)

কাজী নজরুল ইসলামকে কখনো কখনো 'মুসলমান কবি' বলা হইলেও তিনি শুদ্ধ মুসলমানের কবি ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষ আধুনিক বাংলা কবিতার আবাহনে তিনি উদ্বোধকের কিংবা অগ্রপথিকের ভূমিকাও পালন করিয়াছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ হয়ত এ সত্যে সন্দিহান ছিলেন কিন্তু তাঁহার একান্ত অনুরাগী আবদুল কাদির মনে করিতেন, 'অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনে' নজরুল ইসলাম 'পুরোধার ভূমিকা' গ্রহণ করিয়াছিলেন।

AMARBOI.COM

৩

রবীন্দ্র-পরিষদের অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা নিজ হাতে অনুলেখন করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'কবির অভিভাষণ' নামে প্রকাশিত সেই প্রবন্ধের পাশাপাশি বীরবল ওরফে প্রমথ চৌধুরীর 'বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা' রচনাটিও এই পুস্তকে সংবর্ধিত হইল। উপরিস্বরূপ রহিল নজরুল ইসলামের 'আমার কৈফিয়ৎ'। রবীন্দ্র-নজরুল বিতর্কে প্রমথ চৌধুরী ছাড়াও ঢের লেখক শরিক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সেকালের নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার। আর আমাদের কালে সুমিতা চক্রবর্তী। ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের সহিত তাঁহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রচনার এবং এই মাননীয় লেখকদের লেখাগুলিরও পুনর্মুদ্রণ করি। সময়, স্থান ও অনুমতি—এই তিন দেবতার পশ্চাদ্ধাবন কঠিন মনে হওয়ায় তাহা হইতে বিরত রহিলাম।

আমার ঋণ সর্বাগ্রে 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে: স্মৃতিকথা' ও 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা' বই দুইটির লেখক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের (১৮৮৯-১৯৭৩) নিকট। স্বাধীনতার পরের বছর—অর্থাৎ ১৯৭২ সালে—তাঁহার রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হইয়াছিলাম। কাজী নজরুল ইসলামের মাহাত্ম্য বুঝিতে বড় সহায় হইয়াছিলেন তিনি।

কিছুদিনের মধ্যে আবদুল কাদিরের (১৯০৬-১৯৮৪) অমর কীর্তি 'নজরুল রচনা-সম্ভার' এবং 'নজরুল-রচনাবলী'র সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে। এতদিনে বুঝিতে পারিতেছি, পরবর্তী কোন সম্পাদকই তাঁহার কীর্তি অতিক্রম করিতে পারেন নাই; সবাই তাঁহার পরিশ্রমের ফসল আত্মসাৎ করিয়াছেন মাত্র। তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নতুন নতুন নানা ভ্রান্তিও যোগ করিয়াছেন। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বার খণ্ড 'নজরুল-রচনাবলী' এই শোচনীয় কেলেঙ্কারির অবিস্মরণীয় উদাহরণ হইয়া রহিয়াছে।

আজিকার যৎসামান্য পর্যালোচনা আমি চিরস্মরণীয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আর অনতিক্রান্ত আবদুল কাদিরের দরবারে নিবেদন করিলাম।

সলিমুল্লাহ খান
১ ফাল্গুন ১৪২৯

দোহাই

১ কাজী নজরুল ইসলাম, 'কাণ্ডারী হুশিয়ার!' *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭), পৃ. ৩৬-৩৭।

২ কাজী আবদুল ওদুদ ও অনিলচন্দ্র ঘোষ, *ব্যবহারিক শব্দকোষ: বাংলা*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার অভিনব অভিধান, পরিবর্ধিত সংস্করণ (কলিকাতা: প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, প্রকাশকাল অজ্ঞাত)।

৩ হুমায়ুন কবির, *বাঙলার কাব্য*, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৫)।

৪ আবদুল কাদির, 'গ্রন্থ-পরিচয়,' কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭), পৃ. ৬৪১-৬০।

৫ _____ 'প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ,' *নজরুল রচনা-সম্ভার*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ (ঢাকা: পাইওনিয়ার প্রেস, ১৯৬৯ক), পৃ. [ছয়]-[আট]।

৬ _____ 'সম্পাদকের নিবেদন,' *নজরুল রচনা-সম্ভার*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ (ঢাকা: পাইওনিয়ার প্রেস, ১৯৬৯খ), পৃ. [তিন]-[পাঁচ]।

৭ ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, *মণিকোষ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯)।

৮ Sumanta Banerjee, 'Rabindranath—A Liberal Humanist Fallen among Bigoted Bhadraloks,' *Economic and Political Weekly*, vol. 46, no. 24 (11 June 2011), pp. 51-59.

৯ Surendranath Banerjea, *A Nation in Making: Being the Reminiscences of Fifty Years of Public Life*, 2nd imp. (London: Oxford University Press, 1925).

১০ Sugata Bose, *Agrarian Bengal: Economy, Social Structure and Politics: 1919-1947* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

১১ Joya Chatterji, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932-1947* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

১২ Partha Chatterjee, 'On Religious and Linguistic Nationalisms: The Second Partition of Bengal (1999),' *Empire and Nation:*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Essential Writings 1985-2005 (Ranikhet: Permanent Black, 2010), pp. 340-58.

১৩ _____ *Bengal 1920-1947: The Land Question*, reprint (Kolkata: K P Bagchi and Company, 2012).

১৪ P K Dutta, 'War Over Music: The Riots of 1926 in Bengal,' *Social Scientist*, vol. 18, no. 6/7 (June-July 1990), pp. 38-48.

১৫ Parthasarathi Gupta, 'Who Divided the Bengalees?' in Amrik Singh, ed., *The Partition in Retrospect* (New Delhi: Anamika Publishers and Distributors), pp. 212-21.

১৬ Rajat K Ray, 'The Crisis in Bengal Agriculture, 1870-1927—The Dynamics of Immobility,' *Indian Economic and Social History Review*, vol. 10, no. 3 (January 1973), pp. 244-79.

১৭ Rajat [K Ray] and Ratna Ray, 'Zamindars and Jotedars: A Study of Rural Politics in Bengal,' *Modern Asian Studies*, vol. 9, no. 1 (January 1975), pp. 81-102.

১৮ Shila Sen, 'Khilafat Non-Cooperation Movement in Bengal and Hindu-Muslim Relation—An Outline,' *Proceedings of the Indian History Congress*, vol. 51 (1990), pp. 465-68.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়

পরাধীন যুগের—বিশেষ বিংশ শতাব্দীর—বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কাজী নজরুল ইসলাম পত্রপত্রিকায় আত্মপ্রকাশ শুরু করিয়াছেন। তখন সবার উপরে বিরাজমান রবীন্দ্রনাথ।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এয়ুরোপের একটা বড় পুরস্কার জিতিয়াছেন। ক্ষণকাল আগে গত হইয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কিছুদিন না যাইতেই এয়ুরোপের বড় জঙ্গ শুরু হইয়াছে। ১৯২১ সালে বোলপুরের ব্রহ্ম বিদ্যালয়কে 'বিশ্বভারতী' নাম দান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছেন ঠাকুর মহাশয়। শুরু হইয়াছে নতুন যুগ।

১৯২০ সালের কয়েক বছরের মধ্যে খ্যাতিমান হইয়া উঠিয়াছেন কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতায় আর গানে না হইলেও সাংবাদিকতায় আর কারাবাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন তিনি। নজরুলের কারাপ্রবাসকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নামে একখানি পুস্তিকা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রবীণ কবির আশীর্বাদ শিরোধার্য করিয়া তরুণ কবি সম্পাদিত পত্রিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। এইসব কাহিনী কমবেশি সকলেই জানেন।

সকলে আরো জানেন, ১৯২৫ সালের মধ্যভাগে চিত্তরঞ্জন দাশের অকালমৃত্যুর পর বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের রাজনীতি ক্রমশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলপ্রয়োগের খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই খাত হইতে রাজনীতিকে ফিরাইবার যোগ্যতা স্বয়ং চিত্তরঞ্জনও রাখিতেন কিনা সে বিতর্ক চলিতে পারে। চিত্তরঞ্জনের স্থলাভিষিক্ত হইবার যোগ্য সেই যুগে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না বলিয়াই মনে হয়। ততদিনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোকত্যাগী হইয়াছেন। বাঁচিয়া রহিয়াছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর উদয়ের পথে যাঁহার বাণী শোনা যাইতেছে তাঁহার নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

দুর্ভাগ্যের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পেশা আকারে রাজনীতি গ্রহণ করেন নাই। এদিকে তাঁহার পেশা 'আসমানদারি' মানিয়া লইলে অর্থাৎ পরিচয়টা নিছক কবির অধিক ছিল না বলিলে ভারি অন্যায় হয়। সমাজনেতা না হইয়াও তিনি সমাজে যথাপরিমাণে প্রভাববিস্তার করিয়াছিলেন। সেই প্রভাবের প্রকৃতি ও প্রসার কোনটাই চিত্তরঞ্জন দাশের অভাব পূরণ করে নাই—এ কথা অসত্য নহে। ক্ষেত্র হিসাবে সেই প্রভাব কতখানি প্রশস্ত হইয়াছিল তাহা অন্তত একজনের—বিশেষ কাজী নজরুলের—উদাহরণ বিচার করিলে কতক পরিচ্ছন্ন হয়।

AMARBOI.COM

১

নজরুল ইসলাম প্রথম যৌবনে কবি রবীন্দ্রনাথের যতখানি ভক্ত ছিলেন, মধ্যবয়সে অর্ধসমাজনেতা রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী ততখানি হইতে পারেন নাই—এ সত্য অস্বীকার করা কঠিন। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'আমার কৈফিয়ৎ' নামক বিখ্যাত কবিতায় সেই বিরোধের প্রথম আভাস পাওয়া যায়। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ আছে একাধিকবার। সেই উল্লেখে শুনিতে পাওয়া যায় বড় একটা অভিযোগের সুর। পহিলা প্রস্তাবেই নজরুল লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়া যেরকম 'চিরকেলে বাণী' বাহির হয় তাঁহার বাণী সেরকম নহে। চিরকালের তো নহেই, এমনকি সে বাণী স্বকালের কিনা তাহাতেও সন্দেহ। নিজের কবিতাকে নজরুল তুলনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়াছেন শুদ্ধ 'প্রভাতের ভৈরবী'র সহিত। এই প্রস্তাবে ঠাকুর উপস্থিত হইয়াছেন শুদ্ধমাত্র 'রবি' নামে।

এই কবিতার তৃতীয় প্রস্তাবে আবারো হাজির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এইবার তাঁহার উল্লেখ মাত্র 'গুরু' উপাধিযোগে। নজরুল লিখিয়াছেন, 'গুরু কন, তুই করেছিস গুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা!' 'গুরু'র সহিত 'গুরু'র বৈপরীত্য অনুপ্রাসে হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরক্ষণেই নজরুল ইসলাম দাড়ি না চাঁছিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিলেন। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা—ইহার প্রকাশক ঠাকুরের বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—যে পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদধন্য সে তথ্যও এখানে ফাঁস করিয়াছেন তিনি। তাহাও একান্ত নিরপরাধের মতন ভাষায়—যাহার এক পংক্তিতে বসিয়াছেন গুরু, আর পংক্তিতে উপবিষ্ট 'শনিবারের চিঠি'।

চতুর্থ প্রস্তাবে নজরুল ইসলামের উভয় সংকট ধরা পড়িতেছে। তাঁহার এক মুখে দেবদেবীর নাম, আর মুখে আরবি-ফারসি শব্দের ছড়াছড়ি। নজরুলকে হিন্দুরা বলে 'যবন' বা 'নেড়ে' আর মুসলমানেরা মনে করে 'কাফের'। তিনি শহিদ হইতে রাজি, তথাপি আশঙ্কা করেন যে মোল্লারা তাঁহার জাত মারিতে হাত পাকাইতেছেন।

ফারসি শব্দে কবিতা লেখা—মানে বাংলা বাক্যে ফারসি শব্দের গোঁজামিলন দেওয়া—যে অপরাধ বা পাতনেড়ের কর্মবিশেষ তাহা কে বা কাহারা যেন বলিয়া বেড়াইতেছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যে এই বক্তব্যের সমর্থক তাহার অকপট প্রমাণ পাইলেন নজরুল ইসলাম। নজরুলের নামোল্লেখ করিবার মতন পাপ ঠাকুর করিয়াছেন এমন প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায় নাই। তাহাতে কি হইয়াছে! পত্র গন্তব্যে পৌঁছিতে বিলম্ব করে নাই।

'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতার ষষ্ঠ প্রস্তাবে নজরুল আবার রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিলেন। বলিলেন, তিনি নিজে চিরকালের তো নহেনই, এমনকি যুগের কবিও নহেন; তিনি নিতান্ত 'হুজুগের কবি'। এখানে হুজুগের কবি অভিধার অর্থ যদি ধরা হয় 'অনাগত যুগের কবি' তো আরো মজা। আট নম্বর প্রস্তাবে 'রবি' শব্দের হদিশ পুনরায় পাওয়া যায়:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধু! তুমি ত দেখেছ আমায় আমার মনের মন্দিরে।
হাড় কালি হ'ল, শাসাতে নারিনু তবু পোড়া মন-বন্দীরে!
যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল,
মেরে মেরে তা'রে করিনু বিকল,
তবু যদি কথা শোনে সে পাগল! মানিল না রবি গন্ধীরে।
হঠাৎ জাগিয়া বাঘ খুঁজে ফেরে নিশার আঁধারে বন চিরে'!

(ইসলাম ১৯৬৭: ৪৩)

আমাদের দেখা 'নজরুল-রচনাবলী'র বেশির ভাগ সংস্করণে 'গন্ধীরে' শব্দটি ছাপা হইয়াছে। খুব সম্ভব ইহার কারণ ছাপাখানার ভূত। ভূত শব্দের আরেক মানে অতীতের জের—তাহা কে না জানে! আমাদের ধারণা 'রবি' মানে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তেমনি 'গন্ধী' মানে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি হইতে পারে। কবিতার চৌদ্দ নম্বর প্রস্তাবেও নজরুল ইসলাম ঠাকুরের নাম না জপিয়া পারেন নাই:

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।

(ইসলাম ১৯৬৭: ৪৪)

AMARBOI.COM

২

কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা রচনার যে আদর্শকে 'চিরকেলে বাণী' পরিচয়ে ধিক্কার দিয়াছিলেন সে আদর্শকেই ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের ধারক বলিয়া নিন্দা জানাইয়াছেন জার্মান তত্ত্বজ্ঞানী বাল্টার বেনিয়ামিন। বেনিয়ামিন অবশ্য লিখিতেছিলেন নজরুলের প্রায় এক যুগ পর, ১৯৩৫-৩৯ সাল নাগাদ (দ্রষ্টব্য, বেনিয়ামিন ২০১০; বেনিয়ামিন ২০০২; বেনিয়ামিন ২০০৬)। এই যোগাযোগ নিতান্ত কাকতালীয় বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনিয়ামিন তাঁহার ন্যূনাধিক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধটি শেষ করিয়াছেন একপ্রস্ত সংবাদ জানাইয়া। ফ্যাসিস্ট মতাদর্শ আবেগ ও অনুভূতির আশ্রয় লয়। আবেগ শিল্পের জায়গা দখল করে। আর তাহার জওয়াবে শ্রমিকশ্রেণির মতাদর্শে শিল্প ও সাহিত্য রাষ্ট্রের আকার ধারণ করে। শিল্পই আবেগের জায়গা দখল করে।

ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের আরেক হাতিয়ার 'অমর কাব্য' নামক ধারণা। অমর কাব্য ও চিরকেলে বাণী প্রভৃতি ধারণাই মেহনতজীবী মানুষের মানবিক অধিকার কাড়িয়া লওয়ার মোক্ষম হাতিয়ার হইয়া ওঠে। সে কারণেই ফ্যাসিপন্থী রাজনীতি এইসব ধ্যানধারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। বাল্টার বেনিয়ামিনের এই বিচারটা এতদিনে অনেকেরই মনে হইতেছে অকাট্য। এই জায়গায় নজরুল ইসলামের মহত্ত্ব অধিক স্পষ্ট হয়।

বেনিয়ামিন আরো দুই ধারণার সহিত ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের আত্মীয়তা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাদের নাম যথাক্রমে 'অপার্থিব সৃষ্টিশীলতা' আর 'অলৌকিক প্রতিভা'। এই দুই ধারণার অবারিত প্রয়োগ যে বিপর্যয়ের সূচনা ঘটাইতে পারে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতেও ভোলেন নাই বেনিয়ামিন।

আগের কোন প্রস্তাবে নজরুল ইসলাম যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অর্থও এতদিনে ফুরাইয়া যায় নাই। সেই অর্থ বেনিয়ামিন যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার স্বগোত্র—প্রকৃত প্রস্তাবে অগ্রজ। 'অলৌকিক প্রতিভা বা জিনিয়াস নহে, অভিজ্ঞতাই শিল্পের জননী'—নজরুল ইসলামের বক্তব্য এই প্রস্তাবের কম যায় না।

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না'ক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

(ইসলাম ১৯৬৭: ৪৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া যাইবেন না—স্থির থাকিবেন—তাঁহাদেরও চোখে পড়িবে, 'রক্ত-লেখা' পদটি নজরুল ইসলাম পুনশ্চ ব্যবহার করিয়াছেন একেবারে শেষ প্রার্থনার মাথায় পৌঁছিয়াও।

প্রার্থনা ক'রো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!
(ইসলাম ১৯৬৭: ৪৪)

এক 'রক্ত-লেখা' কথার অনেক অর্থ। এক অর্থ 'রক্ত দিয়া লেখা', রক্তকে লাল বানাইয়া লেখা। আরেক অর্থ 'রক্ত-সম্বন্ধীয়', রক্তের বিষয়ে লেখা। আরো অর্থ দাঁড়ায় 'রক্ত ঝরাইবার উদ্দেশ্যে লেখা', দশকে রক্ত দান করিবার আহ্বান জানাইয়া লেখা। মজার মধ্যে, এই তিন অর্থই শেষ পর্যন্ত এক অর্থে স্থির হয়। কি সেই অর্থ? কবিতা আর মোটেও কলম আর কালির বিষয়ে আবদ্ধ নাই। এই অর্থে কবিতাটি 'তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস' যাহারা কাড়িয়া লইতেছে তাহাদের শাসন প্রার্থনা করিতেছে না। প্রার্থনা করিতেছে সেই শাসনের অবসান। উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে তাহাদের সর্বনাশ অর্থাৎ মরণ নামিয়া আসুক।

মজা আরো আছে, সে মজা নিছক 'রক্ত' শব্দের অর্থে লুকাইয়া রহিল না। তাহার গাত্রেও মাখিয়া গেল। মিশিল রূপেও। একরূপ ধরিল। 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতার একাদশ প্রস্তাবে নজরুল যাহা লিখিতেছেন তাহাতে 'খুন' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দু'টো ভাত একটু নুন।
বেলা ব'য়ে যায়, খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন!
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে না'ক তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?
(ইসলাম ১৯৬৭: ৪৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার উপলক্ষে নজরুল ইসলামকে নিশানা বানাইয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৭ সালের শেষদিকে যেসব লাজওয়াব বক্তৃতা বা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার জবাবে নজরুল ইসলাম 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' নামের প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন। 'ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা: রবীন্দ্রনাথের সাধনা' নামক প্রবন্ধে আমরা এই দুঃখের বিষয় স্মরণ করিয়াছি। কেহ কেহ বলিতে চাহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথায় কথায় রক্ত অর্থে খুন শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে নজরুল ইসলামের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই। তিনি পহিলা কোন এক 'বাঙালি কবি'র দোহাই দিয়াছিলেন। মাস তিনেক পর সংশোধনপূর্বক বলিয়াছিলেন তাঁহার দোহাইটি মাত্র 'কোনো একজন বাঙালি হিন্দু কবি'র বেলায় প্রযোজ্য। সুমিতা চক্রবর্তী বলিয়াছেন, এ কথা সত্য হইলে তো আরো লজ্জার কথা! মুসলমান হইলে 'খুন' লিখিতে দোষ নাই, শুদ্ধ হিন্দুতে লিখিলে দোষ হইবে! এই বেদবাক্য স্মরিয়াই বুঝি কাজী নজরুল ইসলাম আগেভাগে লিখিয়া গিয়াছেন:

> সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা কন, 'আড়ি চাচা।'
> যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি নাড়ি কাছা!
>
> (ইসলাম ১৯৬৭: ৪২)

'খুন' শব্দের প্রকৃত লেখক অর্থাৎ 'খুনি' লোকটি কে? কোন 'বাঙালি হিন্দু কবি' এই মহাজন তাহা নির্দেশ করা কোনদিন কর্তব্যজ্ঞান করেন নাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই না করার মধ্যে আমরা সেই পদার্থের আভাস পাই যাহার পুরাতন বাংলা নাম 'মাৎস্যন্যায়'।

মাৎস্যন্যায় শব্দের অর্থস্বরূপ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' ওরফে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত দিয়াছেন: 'মৎস্যসম্বন্ধী ন্যায় অর্থাৎ মৎস্য যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষুদ্র মৎস্য ভক্ষণ করে, সেইরূপ অরাজক রাজ্যে প্রবল দুর্ব্বলকে ধ্বংস করে' (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৪: ১৭৬৬)। আর জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-যোগে মাৎস্যন্যায় শব্দের অর্থ লিখিতেছেন: 'বৃহৎ মৎস্য যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস করে তদ্বৎ বলবান কর্ত্তৃক দুর্ব্বলকে নাশ বা গ্রাস করা; অরাজকতা।' তাঁহার পেশ করা একপ্রস্ত উদাহরণ বাক্য: 'খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মাৎস্য ন্যায় প্রচলিত হইয়াছিল' (দাস ১৯৭৯: ১৭৫০)।

খ্রিস্টীয় বিশ শতকেও মনে হইতেছে এই সত্যের অন্যথা বিশেষ হয় নাই। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁহারা বাংলা ভাষায় কথাবার্তা কহিতেন তাঁহাদের দেশ যে দুই ভাগে নতুন ভাগ হইয়াছিল তাহাও হয়ত ছিল শেষবিচারে এই মাৎস্যন্যায়েরই ফসল। প্রশ্নের মধ্যে এই মাৎস্যন্যায় কাহার দায়, কাহার কর্মফল? বর্ধিত উনিশ শতকের কবি ও গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি এই দায় এড়াইতে পারিবেন? পারিলেও বা কতটুকু পারিবেন?

একদা ইতিহাসজ্ঞ যদুনাথ সরকার কহিয়াছিলেন ভূ-ভারতে নয়া জমানার প্রথম সুতাটা পড়িয়াছিল ইংরেজি ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। তাঁহার মতে ততদিনেও বাংলাদেশের জনগণ জাতি বা 'নেশন' হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা বড়জোর একটা জনগোষ্ঠী বা 'পিপল' মাত্র হইবার পথে দাঁড়াইয়াছিল। সরকার মহাশয়ের দাবি অনুসারে দুইশত বার্ষিক ইংরেজ শাসনের ঔরসে ইতিহাস বাঙালি জাতি নামক একটি ঘটনারও জন্ম দিয়াছিল (সরকার ১৯৭৬: ৪৯৬-৯৯)।

ইতিহাসের সেই উৎপাত যে ১৯৪৭ নাগাদ ছাগশিশুর ন্যায় ধড়েমুণ্ডে আলাদা হইয়া গেল এই সত্য ১৯৪৮ সালে 'বাংলার ইতিহাস' নামক গ্রন্থ সম্পাদনা করিতে বসিয়া অস্বীকার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন 'স্যার' উপাধিপ্রাপ্ত যদুনাথ সরকার। সান্ত্বনার মধ্যে একদা 'স্যার'-যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' শিরোনামা শেষ অভিভাষণে বঙ্গের দ্বিতীয় বিভাগের পরিষ্কার পূর্বাভাস আছে। বেশ জোরেশোরেই আছে। যদিও বা ঠাকুর ইহার দায় ষোল আনা শাসক ইংরেজ জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া আপনকার দায় সারিয়াছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে বস্তুর নাম 'ন্যায়বিচারের অভীপ্সা' তাহার গোড়ায় আছে মাৎস্যন্যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৪৭ সালের বঙ্গবিভাগও মূলত এমন এক আদি মাৎস্যন্যায়েরই ফল। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই সত্যের স্বীকৃতি দিয়াছেন। 'বঙ্গের দ্বিতীয় বিভাজন' নামধেয় প্রবন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন, কি পশ্চিমবঙ্গে কি বাংলাদেশে ইতিহাসের স্মৃতিকথা এই মাৎস্যন্যায়ের সত্য লুকাইয়া রাখিতেই আজ অধিক তৎপর। অথচ দুই দেশেই ন্যায়বিচারের তাগিদ যদি আদপে আসিয়া থাকে তবে আসিতেছে ১৯৪৭ সালের নিহিত সত্য বা বিভাজনকে কেন্দ্র করিয়াই। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিকতার গোড়ায় তাহা হইলে এই ধর্মকেন্দ্রিকতাই অজেয় গৌরবে বিরাজ করিতেছে!

পার্থ চট্টোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন আপাতত মনে হয় তাহাই ধ্রুবঃ '... ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তার আদর্শ প্রত্যাখ্যান করিবা সত্ত্বেও, [আজ পর্যন্ত] সীমান্তের এই পার কি ঐ পার কোথাও বঙ্গের পুনরেকত্রীকরণের কোন অর্থবহ উদ্যোগ দেখা যায় নাই। আর নিকট ভবিষ্যতেও দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয় না' (চট্টোপাধ্যায় ২০১০: ৩৫৭)।

সেপ্টেম্বর ২০২২

AMARBOI.COM

দোহাই

১ কাজী নজরুল ইসলাম, 'আমার কৈফিয়ৎ,' *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭), পৃ. ৪১-৪৪।

২ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*, ২য় ভাগ (ন-হ), পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯)।

৩ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, ২য় খণ্ড (প-হ), ৬ষ্ঠ মুদ্রণ (কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৪)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪ Walter Benjamin, 'The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility [Second Version],' trans. Edmund Jephcott and Harry Zohn, in *Selected Writings*, vol. 3: 1935-1938, trans. Edmund Jephcott, Howard Eiland et al., eds. Howard Eiland and Michael W Jennings (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002), pp. 101-33.

৫ _____ 'The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility [Third Version],' trans. Harry Zohn and Edmund Jephcott, in *Selected Writings*, vol. 4: 1938-1940, trans. Edmund Jephcott et al., eds. Howard Eiland and Michael W Jennings (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006), pp. 251-83.

৬ _____ 'The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility [First Version],' trans. Michael W Jennings, in *Grey Room*, no. 39 (Spring 2010), pp. 11-37.

৭ Partha Chatterjee, 'On Religious and Linguistic Nationalisms: The Second Partition of Bengal (1999),' *Empire and Nation: Essential Writings 1985-2005* (Ranikhet: Permanent Black, 2010), pp. 340-58.

৮ Jadunath Sarkar, 'The End of Muslim Rule,' in Jadu-Nath [*sic*] Sarkar, ed., *The History of Bengal*, vol. II: Muslim Period 1200-1757, 3rd imp. (Dacca: The University of Dacca, 1976), pp. 481-99; 1st ed. August 1948.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৺ ২ ৺

ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা: রবীন্দ্রনাথের সাধনা

পুলিশের জুলুম আমার গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। ওদের জুলুমের তবু একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জুলুম করতে সুরু করে, তার আর পারাপার নেই। এরা তখন হ'য়ে ওঠে টিক্‌টিকে পুলিশের চেয়েও ক্রূর, অভদ্র। যেন চাক-ভাঙা ভীমরুল। জলে ডুবেও নিষ্কৃতি নেই, সেখানে গিয়েও দংশন করবে।

পলিটিক্সের পাঁকের ভয়ে পালিয়ে গেলাম নাগালের বাইরে। মনে করলাম, যাক, এতদিনে একবার প্রাণ ভ'রে সাহিত্যের নির্মল বায়ু সেবন ক'রে অতীতের গ্লানি কাটিয়ে উঠব। ও বাবা! সাহিত্যের আসর যে পলিটিক্যাল আখড়ার চেয়েও নোংরা, তা কে জানত!

—কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৬৭খ: ৬২৪-২৫)

১

ভারতে ব্রিটিশ দখলদারি অবসানের পরের বছর—ইংরেজি ১৯৪৮ সালে—বিলাতের নামজাদা এক বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্যের একপ্রস্ত ইতিহাস বাহির করেন। সেই বই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে গৌড়ের যুগ, নদীয়ার যুগ, কলিকাতার যুগ ও রবীন্দ্রনাথের যুগ—এই চারি যুগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগ করে। বোঝা যায় সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান কোন লোকে উঠিয়াছিল। গ্রন্থ লেখক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ দাবি করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় মাটির কাছাকাছি বাস করিতেন এমন দ্বিতীয় কবিটি এই দুনিয়ার মাটিতে কখনো ভূমিষ্ঠ হয়েন নাই (ঘোষ ১৯৪৮: ১৮৭)।

তাঁহার প্রতিধ্বনি শুনিলাম বছর চারেক পর বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে। বসু লিখিলেন:

> রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথাটা আজকের দিনে যে আর না-তুললেও চলে, সেটাই বাংলা কবিতার পরিণতির চিহ্ন, এবং রবীন্দ্রনাথেরও 'ভক্তিবন্ধন থেকে পরিত্রাণে'র প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন তিনি, বাংলা ভাষার রক্তে-মাংসে মিশে আছেন; তাঁর কাছে ঋণী হবার জন্য এমনকি তাঁকে অধ্যয়নেরও আর প্রয়োজন নেই তেমন, সেই ঋণ স্বতঃসিদ্ধ ব'লেই ধরা যেতে পারে—শুধু আজকের দিনের নয়, যুগে-যুগে বাংলা ভাষার যে-কোনো লেখকেরই পক্ষে, আর যেখানে প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘ'টে যাবে, সেখানেও, সুখের বিষয়, সম্মোহনের আশঙ্কা আর নেই; রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহারিতা ক্রমশই বিস্তৃত হ'য়ে, বিচিত্র হ'য়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে। তাঁরই ভিত্তির উপর বেড়ে উঠতে হবে আগামী কালের বাঙালি কবিকে; এইখানে বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেরও ইঙ্গিত আছে (বসু ১৯৬৬: ৮৪)।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিয়াছে, বিবর্তনের পরবর্তী ধাপটির রূপ কি দাঁড়াইল। বুদ্ধদেব নিজের অভিজ্ঞতা হইতে সাক্ষ্য দিতেছেন:

> কৈশোরকালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরোবার ইচ্ছেটাকেও অন্যায় মনে হ'তো—যেন রাজদ্রোহের শামিল; আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্দ্রাভরা নেশা, তাঁর বেলোয়ারি আওয়াজের আকর্ষণ—তাও আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার। আর অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব ব'লেও ভাবতে পারলো না—যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ-হৈ ক'রে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো (বসু ১৯৬৬: ৭৮)।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভায় বুদ্ধদেব বসু মুগ্ধ, তবে সম্মোহিত নহেন। তাঁহার অনেক দোষ বুদ্ধদেব ধরিয়াছেন। বলিয়াছেন, তাঁহার কবিতা 'অসংযত, অসংবৃত, প্রগল্‌ভ' আর তাহাতে 'পরিণতির দিকে প্রবণতা' নাই, 'আগাগোড়াই তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো' লিখিয়া গিয়াছেন, 'তাঁহার নিজের মধ্যে কোনো বদল' কখনো ঘটে নাই, তাঁহার 'কুড়ি বছর আর চল্লিশ বছরের লেখায় কোনোরকম প্রভেদ বোঝা যায় না' ইতি আদি। এত এত কথার পরও তিনি স্বীকার করিলেন, 'নজরুলের দোষগুলি সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমস্ত দোষ ছাপিয়ে ওঠে; সব সত্ত্বেও এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি' (বসু ১৯৬৬: ৭৯)।

নজরুল ইসলাম এই যে 'রবিতাপের চরম সময়ে রাবীন্দ্রিক বন্ধন' ছিঁড়িয়া বাহির হইলেন—বুদ্ধদেব বসুর কথায় বলিতে 'অসাধ্যসাধন' করিলেন—তাহা কি করিয়া সম্ভব হইল? বুদ্ধদেবের ধারণা, তাহা সম্ভব হইয়াছিল কতকগুলি 'আকস্মিক কারণেই', যাহার পিছনে 'সাধনার কোনো ইতিহাস' নাই।

আমরা এই জায়গায় তর্ক করিয়া সময়ের অপচয় করিব না। বুদ্ধদেব বসুর ব্যাখ্যা তাঁহার আপন স্বভাবের মতন চপল, একটুখানি ভাসাভাসা—শরৎকালের পেঁজা তুলা তুল্য মেঘের মতন। তাহাতে কদাচ বৃষ্টি হয় না। তিনি নজরুলের ব্যাখ্যা খুঁজিলেন মাত্র তাঁহার জীবনের স্থূল পটভূমিকায়; মনের অজ্ঞান গড়নে প্রবেশ করার সুযোগ পাইলেন না:

মুসলমান তিনি, সেই সঙ্গে হিন্দু মানসও আপন ক'রে নিয়েছিলেন—চেষ্টার দ্বারা নয়, স্বভাবতই। তাঁর বাল্য-কৈশোর কেটেছে—শহরে নয়, মফস্বলে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুল-কলেজে 'ভদ্রলোক' হবার চেষ্টায় নয়, যাত্রাগান লেটো গানের আসরে; বাড়ি থেকে পালিয়ে রুটির দোকানে, তারপর সৈনিক হ'য়ে। এই যেগুলো সামাজিক দিক থেকে তাঁর অসুবিধে ছিলো, এগুলোই সুবিধে হ'য়ে উঠলো যখন তিনি কবিতা লেখায় হাত দিলেন। যেহেতু তাঁর পরিবেশ ছিলো ভিন্ন, এবং একটু বন্য ধরনের, আর যেহেতু সেই পরিবেশ তাঁকে পীড়িত না-ক'রে উল্টে আরো সবল করেছিলো তাঁর সহজাত বৃত্তিগুলোকে, সেইজন্য, কোনোরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না-নিয়েও শুধু আপন স্বভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথের মুঠো থেকে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন (বসু ১৯৬৬: ৭৯)।

বাংলা সাহিত্যের পালাবদলে নজরুল ইসলামের পরিচয়টা ঠিক কি দাঁড়াইল? বুদ্ধদেব বসু বলিয়াছেন, নজরুলের কবিতায় যে পরিমাণ উত্তেজনা ছিল সে পরিমাণ পুষ্টি ছিল না। 'তবু অন্তত নতুনের আকাঙ্ক্ষা' তিনি জাগাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব লিখিলেন:

... তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব বস্তুত বেশি স্থায়ী হ'লো না, কিংবা তেমন কাজেও লাগলো না, তবু অন্তত এটুকু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। যে-আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগালেন, তার তৃপ্তির জন্য চাঞ্চল্য জেগে উঠলো নানা দিকে, এলেন 'স্বপনপসারী'র সত্যেন্দ্র দত্তীয় মৌতাত কাটিয়ে, পেশীগত শক্তি নিয়ে মোহিতলাল, এলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগভীর—কিন্তু তখনকার মতো ব্যবহারযোগ্য—বিধর্মিতা, আর এই সব পরীক্ষার পরেই দেখা দিলো 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো (বসু ১৯৬৬: ৮০)।

বুদ্ধদেব বসুর রায় যদি সত্য হয় তো বলিতে বাধা নাই, নজরুল ইসলামই বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের প্রকৃত প্রবর্তক। সত্যের খাতিরে বলিতে হইবে, বুদ্ধদেব স্বয়ং সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, নজরুল ইসলাম নিজে নতুন যুগের প্রবর্তন করেন নাই;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন যুগ আগাইয়া আনিয়াছেন মাত্র। অধিক কি, নতুন যুগ আগাইয়া আনিয়াছেন বটে, তবে নিজে তাহা জানিতেন না। কারণ, বুদ্ধদেবের মতে, নজরুলের লেখায় 'সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই।' এক কথায় নজরুল সাহিত্যে বিদ্রোহী নহেন, তাঁহাকে বড়জোর বিদ্রোহে উস্কানিদাতার মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে। এই সোনার পাথরবাটির সম্ভাবনা কেন এবং কিভাবে তৈয়ার হইল তাহাও ব্যাখ্যা করিয়াছেন বুদ্ধদেব বসু।

> যদি তিনি ভাগ্যগুণে গীতকার এবং সুরকার না-হতেন, এবং যদি পারস্য গজলের অভিনবত্বে তাঁর অবলম্বন না-থাকতো, তা'হলে রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথেরই আদর্শ মেনে নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন তিনি। কিন্তু যে-অতৃপ্তি তাঁর নিজের মনে ছিলো না, সেটা তিনি সংক্রমিত ক'রে দিলেন অন্যদের মনে; যে-প্রক্রিয়া অচেতনভাবে তাঁর মধ্যে শুরু হ'য়ে, তা সচেতন স্তরে উঠে আসতে দেরি হ'লো না (বসু ১৯৬৬: ৮০)।

বোঝাই যায়, নজরুল ইসলামকে পাস নম্বর দিতে বুদ্ধদেব বসু কড়া স্কুল মাস্টারের যোগ্য ব্যবহার করিতেছেন। তিনি নজরুলকে 'কল্লোল যুগ' নামক আন্দোলন হইতে আলাদা করিয়াছেন আর বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের মুঠা হইতে পালাইবার পরও তাঁহার মনে অতৃপ্তির অস্তিত্ব ছিল না। তাহা নাই বা থাকিল। তিনি না জানিয়াই এত বড় একটা ইনকিলাবের সূচনা করিলেন। ইহাও বা কম কিসের!

> যাকে 'কল্লোল'-যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অভাববোধ জেগে উঠলো—বন্ধ্য প্রাচীনের সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়, অর্বাচীনের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই। মনে হ'লো তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হ'লো তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের অনস্বীকার্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন (বসু ১৯৬৬: ৮০)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিদ্রোহের যোগফল 'বাংলা কবিতার মুক্তি' কিংবা (সাপকে সাপ আর ব্যাঙকে ব্যাঙ বলিতে অমত না করিলে) বলা যায় 'রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে নিষ্কৃতি'। বুদ্ধদেবের ভাষায়:

> এই বিদ্রোহে আতিশয্য ছিলো সন্দেহ নেই, কিছু আবিলতাও ছিলো, কিন্তু এর মধ্যে সত্য যেটুকু ছিলো তা উত্তরকালের অঙ্গীকরণের দ্বারা প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এর মূল কথাটা আর-কিছু নয়—সুখস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করার, প্রতিরোধ করার পরিশ্রম। প্রয়োজন ছিলো এই বিদ্রোহের—বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য নিশ্চয়ই, রবীন্দ্রনাথকেও সত্য ক'রে পাবার জন্য (বসু ১৯৬৬: ৮০-৮১)।

তাহা হইলে ঘটনা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াইল? বুদ্ধদেব বসুর অকরুণ অভিমত:

> নজরুল ইসলাম থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অবকাশ—এই কুড়ি বছরে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রাশ্রিত নাবালক দশার অবসান হ'লো। এর পরে যাঁরা এসেছেন এবং আরো পরে যাঁরা আসবেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে আর-কোনো ভয় থাকলো না তাঁদের, সে-ফাঁড়া পূর্বোক্ত কবিরা কাটিয়ে দিয়েছেন (বসু ১৯৬৬: ৮৩)।

আমি জানি, বুদ্ধদেব বসুর এই পরিণামদর্শী (বা টেলিয়োলজিকাল) বিচারের সহিত সকলেই একমত পোষণ করিবেন না। যেমন করেন নাই কাজী আবদুল ওদুদ কিংবা হুমায়ুন কবির প্রভৃতি সাহিত্যবিশারদ। তবে মোটা মোটা দাগে তাঁহারাও বসুর মাসতুত-পিসতুত ভগিনী-ভ্রাতার মতন আচরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর মতন আবদুল ওদুদও নজরুল ইসলামকে কল্লোল যুগের লেখকদের হাতে সমর্পণ করেন নাই। তবে বসুর মতের বিরুদ্ধে তিনি খাড়া বলিয়াছেন, নজরুল ইসলামকে কোনক্রমেই নতুন যুগের প্রবর্তক বলা যাইবে না (ওদুদ ১৯৮৩: ৮২-৮৪)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল ওদুদ নজরুল ইসলামকে টানিয়া-টুনিয়া একজন 'স্মরণীয় কবি' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন—এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নজরুলের সক্রিয় জীবনাবসানের তিন কি চারি বৎসর পর—১৯৪৫ সালে—ওদুদ লিখিয়াছেন, 'বাংলার সাহিত্যিকসমাজ আজ প্রায় নিঃসন্দেহ যে নজরুল বিংশ শতাব্দীর বাংলার—শুধু বাংলার নয় ভারতের—একজন স্মরণীয় কবি' (ওদুদ ১৯৮৩: ৭৭)।

এই অসাধারণ ঐতিহাসিক মর্যাদার বাহিরে শুদ্ধ সাহিত্যিক হিশাবে কাজী নজরুলের মর্যাদাটা কি? উত্তরে আবদুল ওদুদ ১৩৩১ বাংলা মোতাবেক ১৯২৪ ইংরেজি সনে জানাইয়াছিলেন—'অকিঞ্চিৎকর'। মন্তব্যটি তিনি পেশ করিয়াছিলেন নজরুলের অতি বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' প্রসঙ্গে (দ্রষ্টব্য, ওদুদ ১৯৮৩: ৪৩৩)। পরে ১৩৪৮ বাংলা নাগাদ তিনি আবার বলিয়া রাখিলেন, '... নজরুলের রচনা, বিশেষ করে তাঁর "বিদ্রোহী"যুগের রচনা, অনবদ্য নয়' (ওদুদ ১৯৮৩: ৮৩)।

অথচ কল্লোল যুগের কবিকুল ও তাঁহাদের পরের যুগের কোন কোন কবি বিষয়ে কাজী আবদুল ওদুদ ঢের উদার হইয়াছিলেন। এই নবীনদের মধ্যে যাঁহাদের নাম তিনি উদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অকালমৃত গোকুল নাগ, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্র পর্যন্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি সদুক্তি কর্ণামৃত দলের মন্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিলেন আবদুল ওদুদ:

> আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের মুটে মজুরের,
> আমি কবি যত ইতরের।
>
> (উদ্ধৃত, ওদুদ ১৯৮৩: ৭৮)

ওদুদ জানাইতেছেন, এই 'অতি-আধুনিকদের' সহিত রবীন্দ্রনাথের বিরোধ বাধিয়াছিল। তাঁহার কথায়: 'এঁদের সঙ্গে তাঁর অপ্রিয় বাণী-বিনিময়ও চল্‌লো'। সৌভাগ্যের মধ্যে, সেই বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। কারণের মধ্যে দুই। একে রবীন্দ্রনাথ তরুণদের কাছে ছুটিলেন, নিজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণতর হইলেন, লিখিলেন 'শেষের কবিতা'। তাহার উপর এই তরুণেরাও তলে তলে জনে জনে এক একটি রবীন্দ্রনাথ হইয়া উঠিলেন। আবদুল ওদুদের ভাষ্য: 'তরুণদের দাবি এই যে অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উপরে পড়েছিল তাঁদের প্রভাব—রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনায় রয়েছে তার পরিচয়।' ওদুদ বলিতেছেন:

> অতি-আধুনিকদের এই দাবি যে অপ্রবল নয় তার প্রমাণ-স্বরূপ কেউ কেউ উল্লেখ করেন তাঁর শেষ বয়সের বিখ্যাত উপন্যাস 'শেষের কবিতা', তাঁরা বলতে চান এতে নায়ক-নায়িকার প্রেমের যে-পরিণতি রবীন্দ্রনাথ দেখালেন এর পূর্বে সে-পরিণতি দেখাতে তিনি হয়ত সমীহ করতেন। কিন্তু অতি-আধুনিকদের দাবি অপ্রবল না হলেও সত্য নয় এই বড় কারণে যে তরুণরা মুখ্যত আত্মকেন্দ্রী ও ভোগবাদী কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আত্মকেন্দ্রী ও ভোগবাদী যতখানি তার চাইতে গতিবাদী ও বৃহত্তর-মানবসমাজের স্পর্শকামী বেশী (ওদুদ ১৯৮৩: ৭৯)।

এই অতি নির্লজ্জ দাবির পরও আবদুল ওদুদ স্বীকার করিয়াছেন, এই তরুণদের সহিত অচিরেই রবীন্দ্রনাথের আপসরফা হইয়াছিল, কারণ 'রবীন্দ্রনাথ চিরতারুণ্যের কবি, তার উপর তিনি অচিরেই নিঃসন্দেহ হলেন এঁদের অনেকের সাহিত্যিক সম্ভাবনা সম্পর্কে' (ওদুদ ১৯৮৩: ৭৮-৭৯)।

সকল প্রশংসা নিঃসন্দেহে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাপ্য।

২

প্রথম মহাসমরোত্তর নবযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নালিশ নানান দফায়। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি জানিলে এইসব নালিশের ভিত্তি সম্পর্কে বুঝিতে সুবিধা হয়। ১৩৩৪ শ্রাবণে প্রকাশিত 'সাহিত্যধর্ম'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধে তিনি সে ধারণা কিছু খোলাসা করিয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য, ঠাকুর ১৪১৪: ৭৩-৮৩)।

ঠাকুরের পহিলা আপত্তি নবযুগের সাহিত্য 'বে-আব্রু' আর 'বে-আব্রুতা' ব্যাধিটা তাঁহার বিচারে যুগের হুজুগ মাত্র—'নিত্যপদার্থ' নহে। তাঁহার ভোগে নিত্যপদার্থ বলিয়া বিশেষ যে প্রকারের খাদ্য লাগিত নবযুগের সাহিত্যে সেই পদার্থের বড় অভাব। অভাব কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ দুই অপরাধী শনাক্ত করিলেন। এক অপরাধীর নাম যাহাকে বলে মানব স্বভাবের পশুভাব বা দেহধর্ম। দুই নম্বর অপরাধী বিজ্ঞান—বিশেষ বলিতে বিজ্ঞানমদে মত্ত গণতন্ত্র। ঠাকুরের 'চিরন্তন' ভাষায় এই অপরাধীর আসল নাম 'বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি'।

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, মানুষের স্বভাবে একটা ভাব আছে যাহা পশুর ভাব—সেখানে হয় প্রজননের কাজ। এই ভাবের অপর নাম 'জীবধর্ম'। আরেকটা ভাব মানুষের—সেখানে সে প্রেমের কারবারি। এই ব্যবসায়ের ঠাকুরিয়া নাম 'চিত্তধর্ম'। এই দুইয়ের মধ্যে, তাঁহার ভাষায়, 'যৌনমিলনের জীবধর্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম উভয়ের সীমানা-বিভাগ' লইয়া 'সহজেই গোলমাল বাধে'। এই বিষয় লইয়া আধুনিক সাহিত্যে 'দেওয়ানি ফৌজদারি মামলা চলছেই'। কারণ, 'সাহিত্যে আপন পুরো খাজনা আদায়ের দাবি ক'রে পশুর হাত, মানুষের হাত, উভয়ে একসঙ্গেই অগ্রসর হয়ে আসে' (ঠাকুর ১৪১৪: ৭৯)।

মাঝে মাঝে এক একটা যুগ আসে যাহাতে 'বাহ্য কারণে' কোন বিশেষ 'উত্তেজনা' প্রবল হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথ খোটা দিলেন, 'মধ্যযুগে এক সময়ে'—এয়ুরোপে—'শাস্ত্রশাসনের খুব জোর ছিল।' সেই শাসন বিজ্ঞানকে অভিভূত করিয়াছিল। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে—এই কথা বলিতে গেলে মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল শাস্ত্রশাসনের পাণ্ডারা। তাঁহারা ভুলিয়াছিলেন যে বিজ্ঞানের রাজত্ব বিজ্ঞানের রাজ্য জুড়িয়া—ধর্মের একাধিপত্য যেমন ধর্মের রাজত্বসীমায়। সেই সময় ধর্মশাস্ত্র প্রবল আর বিজ্ঞান-ব্যবহার দুর্বল ছিল। আজিকার যুগের দশা বিপরীত। এ যুগে বিজ্ঞান প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও সে আপনার সীমা মানিতে চাহিতেছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাকুরের কথায়, 'তার প্রভাব মানব-মনের সকল বিভাগেই আপন পেয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তক্‌মা পরে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না' (ঠাকুর ১৪১৪: ৮০)।

নতুন যুগের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নালিশের গোড়ায় আছে এই অনধিকার চর্চা বা অবৈধ অনুপ্রবেশের গল্প। তিনি জানাইতেছেন:

> আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চলছে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্‌টোরেশন-যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটিকা চিরদিনের মতো পায় নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিঁকতে পারে না (ঠাকুর ১৪১৪: ৮০-৮১)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করিতেছেন বিজ্ঞান আর সাহিত্য দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। তিনি লিখিয়াছেন: 'বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাববর্জিত; তার ধর্মই হচ্ছে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাতি কৌতূহল।' তিনি ঠাহর করিলেন: 'এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরছে। অথচ সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্ছে তার পক্ষপাত-ধর্ম; সাহিত্যে বাণী স্বয়ংবরা। বিজ্ঞানে নির্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের সেই বরণ করে নেবার স্বভাবকে পরাস্ত করতে উদ্যত (ঠাকুর ১৪১৪: ৮০)।

একটু আগেই বলিয়াছি, বাংলাদেশে ১৯২০ সালের পর সাহিত্যচর্চায় যে নতুন 'বে-আব্রুতা' দেখা দিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে ঠাকুরের নালিশ: একে তো জিনিশটা 'বিদেশের আমদানি', তদুপরি তাহার পিছনে 'বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি'। 'বে-আব্রুতা' জিনিশটা মোটেও 'নিত্যপদার্থ' নহে। কেননা যাহা নিত্য তাহা 'অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না'। ঠাকুরের কথায়, 'মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য।' অথচ 'এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য; নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ' (ঠাকুর ১৪১৪: ৮১)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ পর্যন্ত বিবাদটা রুচির প্রশ্নে আসিয়া ঠেকে। সত্য অনেকান্ত। তবে রুচির বিরোধটা ছিল একান্ত মীমাংসার অপেক্ষায়। 'রবীন্দ্রনাথের রুচির সৌকুমার্য থেকে অতি-আধুনিকরা সেদিন যথেষ্ট দূরে ছিলেন'—বলিয়াছেন কাজী আবদুল ওদুদ (ওদুদ ১৯৮৩: ৭৯)।

পক্ষান্তরে, পরাধীন দেশে আধুনিক সাহিত্য ব্যবসায়ের দুর্ভাগ্য দ্বিবিধ। একদিকে সে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবের শিকার। তাই নির্লজ্জ। এই নির্লজ্জতাও আবার একটা 'ধার-করা নকল' জিনিশ। বিজ্ঞানের হাটে হট্টগোল আছে—তাহা না হয় মানিয়া লওয়া গেল, কিন্তু যে দেশে হাটই বসে নাই সেখানে হট্টগোলের অজুহাত থাকিতে পারে না। ঠাকুর বলিতেছেন:

> কিন্তু যে দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায় নি সে দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে! ভারতসাগরের ও পারে যদি প্রশ্ন করা যায় 'তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন?' উত্তর পাই, 'হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেছে!' ভারতসাগরের এ পারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, 'হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরি' (ঠাকুর ১৪১৪: ৮৩)।

নতুন যুগের সাহিত্য ও শিল্পকলার আন্দোলনকারী সাহিত্যিক-কবিগণ দাবি করিয়াছিলেন তাঁহারা বিজ্ঞানের ছাত্র। চিরন্তন বা নিত্যবস্তুর সাধনা তাঁহারা করিবেন না, করিবেন নিছক সত্যবস্তু বা রিয়ালিটির অর্চনা। এই সত্যবস্তুকে আজগুবি মনে হইলেও করিবার কিছু ছিল না। নতুন এয়ুরোপে এই মতেরই জয়জয়কার শ্রুত হয় ১৯২০ সাল নাগাদ। রবীন্দ্রনাথের চোখে ইহাই সর্বনাশের প্রকৃষ্ট লক্ষণ।

পরাধীন দেশে এই মতের প্রাদুর্ভাবে তিনি শঙ্কিত ও বিচলিত। 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে তিনি মত প্রকাশ করিলেন, নতুন এয়ুরোপিয়া সাহিত্য মনে করিত 'ভাষাটাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ।' ঠাকুর বলিলেন, 'চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজ্‌ম্' (ঠাকুর ১৪১৪: ৮৬)।

ঠাকুরের একান্ত আশা, ব্যামোস্বরূপ এই বীভৎসতা হয়ত একদিন কাটিয়া যাইবে। এয়ুরোপ রক্ষা পাইবে। কারণ এয়ুরোপের স্বাস্থ্য আছে। কিন্তু পরাধীনতার শাপে দুর্বল দেশে যখন রোগের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে তখন 'অন্যান্য নানা দুর্গতির মধ্যে এই আর-একটা উপদ্রবের বোঝা' কি সহিবে তাহার? আশঙ্কার কথা, সহিবে না।

এতক্ষণে রবীন্দ্রনাথ আসল কথাটা পাড়িলেন। এই বিদেশের আমদানি বাণিজ্যে এক্ষণে পূর্ব এয়ুরোপেরও ভাগ বসিল। রাশিয়ায় জারতন্ত্র ভাঙ্গিয়া 'বলশেবিকতন্ত্র' দেখা দিল। আর 'সাহিত্যে নবত্ব' ব্যবসায়ীরাও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এইখানেই কবিগুরুর ভয়। সাহিত্যে নতুন গুরু দেখা দিয়াছে। সে গুরুর মাথার টুপি আবার লাল। এই সাজ 'উগ্র সাজ'।

> ভাবনার বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের শাস্ত্রমানা ধাত। এইরকম মানুষরা যখন আচার মানে তখন যেমন গুরুর মুখের দিকে চেয়ে মানে, যখন আচার ভাঙে তখনো গুরুর মুখের দিকে চেয়েই ভাঙে। রাশিয়া বা আর-কোনো পশ্চিমদিগন্তে যদি গুরু নবীন বেশে দেখা দেন, লাল টুপি পরে বা যে-কোনো উগ্র সাজেই হোক, তবে আমাদের দেশের ইস্কুল-মাস্টাররা অভিভূত হয়ে পড়েন (ঠাকুর ১৪১৪: ৮৭)।

১৯২০ সালের পর বাংলায় যাঁহারা সাহিত্যে নবত্বের ব্যবসায়ে নামিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকেই রবীন্দ্রনাথ খারিজ করিয়া দিয়াছেন বলা যাইবে না। কাহারো কাহারো জন্য রবীন্দ্রনাথ—আবদুল ওদুদের বর্ণনা অনুযায়ী—এমনকি 'চিন্তিত' হইলেন। কাহারো কাহারো লেখায় আশার আলো দেখিতে পাইলেন। যাঁহাদের লেখা তিনি ১৯২৭ সালে (মোতাবেক ১৩৩৪ বাংলায়) তারিফযোগ্য মনে করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার। ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও। ইঁহাদের 'বলিষ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পনা' আর 'ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায়' দেখিয়া তিনি বড়ই বিস্মিত। ঠাকুর খবর রাখিতেন, নবীন লেখকদের মধ্যে মোহিতলাল সাধারণের কাছে ততদিনে খ্যাতিলাভ করিয়া ফেলিয়াছেন। দলের হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এই অভিবাদন করিলেন: 'এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এইজন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তাড়া-মারা পালোয়ানি নেই' (ঠাকুর ১৪১৪: ২৭৮)।

মোহিতলাল হইলেন বিশেষ—অর্থাৎ নিয়মের অতিক্রম। নতুন যুগের সাহিত্য মোহিতলালকে আদর্শ করিলে হয়ত রবীন্দ্রনাথ নতুন যুগের অভ্যুদয়ে অভিভূতই হইতেন। দুর্ভাগ্যের মধ্যে, তাহা হয় নাই। বরং 'রিয়ালিটি' বা নিছক সত্যবস্তুর নামে আধুনিক সাহিত্যে দুইটা বাজে বস্তুর দস্তুর হইয়াছিল। একটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দারিদ্র্যের আস্ফালন', আরটি 'লালসার অসংযম'।

লালসার অসংযম জিনিশটা, রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবুল করিয়াছিলেন, পুরাপুরি বিদেশ হইতে আমদানি করা পণ্য নহে। 'একদিন আমাদের দেশে নাগরিকতা যখন খুব তপ্ত ছিল,' ঠাকুর লিখিয়াছেন, 'তখন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের যথেষ্ট আদর দেখেছি। মদনমোহন তর্কালংকারের মধ্যেও সে ঝাঁজ ছিল। তখনকার দিনের নাগরিক সাহিত্যে এ জিনিসটার ছড়াছড়ি দেখা গেছে' (ঠাকুর ১৪১৪: ৮১)।

এক্ষণে ঠাকুর স্বীকার করিলেন, লালসা জিনিশটা চিরন্তন। অবশ্য চিরন্তন হইলেই শ্রদ্ধেয় হইবে এমন কোন কথা নাই। কারণ 'লালসা' বিপজ্জনক। শুদ্ধ সমাজের পক্ষে নহে, সাহিত্যের পক্ষেও তাহা অনিষ্টকর। 'বিপদের কারণটা হচ্ছে,' রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'ওটা অত্যন্ত সস্তা—ধুলোর উপরে শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য' (ঠাকুর ১৪১৪: ৮৯)।

সাহিত্যে লালসার মতন আর একটা জিনিশের নাম দারিদ্র। সাহিত্যে দারিদ্র লইয়া ব্যস্ত থাকাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করিতেন 'দারিদ্র্যের আস্ফালন'। তাঁহার মতে, যখন তখন এই আস্ফালনের মধ্যে বরং লেখকের শক্তির দারিদ্র্যই প্রকাশ পায়। ইহার ফল লেখকের পক্ষে একটা কৃত্রিম 'সস্তা' সাহিত্য আর বাছবিচারহীন পাঠকের পক্ষে 'একটা সাহিত্যিক অপথ্য'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই 'সহজ এবং চলতি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের' যাঁহারা ব্যবসায়ী তাঁহাদের নীতির ঘরেও দারিদ্র আবিষ্কার করিয়াছেন নীতিকুবের রবীন্দ্রনাথ।

> অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় 'দরিদ্রনারায়ণ'-এর ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেন নি—ভালোরকম উপার্জনও করেন, সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকেন—দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝাল-মসলার মতো ব্যবহার করেন (ঠাকুর ১৪১৪: ৮৮)।

এই কথাগুলি লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করিলেন তিনি ধৈর্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বক্তব্য ছাড়িয়া তিনি বক্তাদের আক্রমণ করিয়া বসিলেন। ক্ষতিপূরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ আগাম বলিলেন, 'অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্যবেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে।' তিনি সাবধান করিয়া দিলেন: উহার যেন অপব্যবহার না হয়, উহার ব্যবহার যেন 'একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ' হইয়া না ওঠে। রবীন্দ্রনাথ উবাচ:

> শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেইসঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে ব'লেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্যঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকে নি। 'নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করছি' জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখি নি—দরিদ্রনারায়ণের পূজারির মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে-সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন ব'লেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নি (ঠাকুর ১৪১৪: ২৭৮)।

মোহিতলাল মজুমদার আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে যুগের দাবি মিটাইবার তাগিদটা স্পষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কথা কয়টি পত্রিকায় ছাপা হইলেও শেষ পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার সময় টিকিয়া থাকে নাই; কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এ যুগের সম্পাদকদের কল্যাণে তাহা আমরা—বাছবিচারমুক্ত পাঠিকারাও—'বর্জিত অংশ' আকারে পাইতেছি। কবি যাহা বর্জন করিয়াছিলেন তাহা যতক্ষণ আমাদের গোচরে আসে নাই ততক্ষণ যাহা রাখিয়া দিয়াছিলেন তাহার অর্থও পরিষ্কার বোঝা যায় নাই।

৩

বুদ্ধদেব বসু যাঁহাকে বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের পরে 'প্রথম মৌলিক কবি'—রবীন্দ্রনাথের তৈরি বাগ্বিধি অনুসারে 'প্রথম অপূর্ব কবি'—তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছু বলিলেন না কেন? অবশ্য ১৯২৭ সালের এক প্রবন্ধে তিনি কবুল করিয়াছিলেন, 'আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাই নি, এ কথা আমাকে মানতেই হবে' (ঠাকুর ১৪১৪: ৮৭)।

তবে এই কথার পিঠেই তিনি মোহিতলাল আর শৈলজানন্দের তারিফ করিয়াছিলেন। এই সময়ে—১৩৩৪ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৯২৭ ইংরেজির ১৩ ডিসেম্বর—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত নবগঠিত 'রবীন্দ্র-পরিষদ' অনুষ্ঠানের পতাকাতলে ঠাকুরকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সংবর্ধনার উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পরের সপ্তাহে গোটা দুই পত্রিকাযোগে যুগপদ প্রচারিত হয়। পত্রিকা দুইটির একটি 'শনিবারের চিঠি'। অন্যটির নাম 'বাঙ্গলার কথা'।

'শনিবারের চিঠি' বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত পত্রিকা। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া রবীন্দ্রনাথের কথা বাঁকাইয়া-চুরাইয়া, চমক লাগাইয়া দেওয়ার মতলবে প্রকাশ করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু 'বাঙ্গলার কথা' সেইরূপ অভিসন্ধি করিত এমন সন্দেহ কেহ তখন পর্যন্ত করেন নাই। দুই পত্রিকায় যখন একই বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তখন স্বভাবতই কথাটার একটা ভিত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে ধরিয়া লইতে কাহারো ক্লেশ হয় নাই। অন্তত নজরুল ইসলামের হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সারকথা 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল ১৩৩৪ সালের ৪ পৌষ তারিখে। নজরুল আপনকার প্রতিবাদ প্রবন্ধটা ছাপাইলেন গোটা দশ দিন পর—মানে ১৪ পৌষ ১৩৩৪ মোতাবেক ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৭ নাগাদ। সাপ্তাহিকের নাম 'আত্মশক্তি' (কাদির ১৯৬৭: ৬৫৭)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতার ত্রিসীমানায় নজরুল ইসলামের নাম নাই। নজরুল অবশ্য জ্যেষ্ঠ কবির নামোল্লেখ করিতে কসুর করিলেন না। শুদ্ধ প্রেসিডেন্সি কলেজে দেওয়া কবির অভিভাষণের কথা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না তিনি, কবির আর আর প্রবন্ধের আলোচনাও খানিক জুড়িয়া দিলেন। তরুণ সাহিত্যকে নজরুল তুলনা করিলেন বালক অভিমন্যুর সহিত আর 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতির হামলার তুলনা কাটিলেন সপ্তমহারথীর মারের সহিত। রবীন্দ্রনাথকে ডাকিলেন 'উভয় পক্ষের পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম-সম সেই মহারথী' বলিয়া। নজরুল বুঝিলেন ভীষ্ম-সম রবীন্দ্রনাথও 'এই অভিমন্যু-বধে সায়' দিয়াছেন; সঙ্গে আক্ষেপও করিলেন: 'মহাভারতের ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে সায় দেননি, বৃহত্তর ভারতের ভীষ্ম সায় দিয়েছেন—এইটেই এ-যুগের পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক' (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৬)।

কি অপরাধ নজরুলস্বরূপ অভিমন্যুর? তালিকাটা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। এই নতুন সাহিত্য শক্তিহীন, অপটু, কৃত্রিম। 'সাহিত্যে নবত্ব' নামক নিবন্ধে ঠাকুর বলিয়া রাখিয়াছেন, 'অপটুই কৃত্রিমতা-দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ' (ঠাকুর ১৪১৪: ৮৮)। ঠাকুরের বাক্য পুরাটা উদ্ধার না করিলে মনে হয় অন্যায় হইবে:

> বাঁধি গতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই বলেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ করে রাখে। বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি করে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঠে—লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে—অপটু লেখকের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর-একটা লালসার অসংযম (ঠাকুর ১৪১৪: ৮৮)।

নজরুল ইসলাম এক্ষণে একটা অপ্রীতিকর প্রশ্ন তুলিলেন: ঠাকুর কি নতুন লেখকদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র লইয়াও বিদ্রূপ করিতে শুরু করিয়াছেন? অন্তত তাঁহার সাম্প্রতিক লেখার সুরে সেই বিদ্রূপের আভাস পাওয়া কঠিন নহে, বলিলেন নজরুল। পূজ্য পিতামহের চরণে নিবেদন করিলেন, '... তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুন, তা হয়ত সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত আপনার এই দারিদ্র্য-যন্ত্রণাকে উপহাস ক'রে যেন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দেন। শুধু ঐ নির্মমতাটাই সইবে না' (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৯)।

নজরুল ইসলামের জবান অনুসারে: 'আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম ব'লে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি। এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ঐ দারিদ্র্য ব্যতীত হয়ত আর সব দুঃখের সাথেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পেলেও রাগ করিনি' (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৯)। নজরুল যোগ করিয়াছেন:

কি ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়—লক্ষ্মীর কৃপায় কবিগুরুর তা জানা নেই। ভগবান করুন, তাঁকে যেন জানতে না হয়। কবিগুরু কোনদিন আমাদের মত সাহিত্যিকের কুটীরে পদার্পণ করেননি—হয়ত তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ন হ'ত না তাতে—নৈলে দেখতে পেতেন, আমাদের জীবন-যাত্রার দৈন্য কত ভীষণ! এই দীন-মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন ক'রে। দেশে দেশে প্রোপাগাণ্ডা করা ত দূরের কথা, বাড়ী ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালিগুলোকে লুকাতে পারিনে। ভদ্র শিক্ষিতদের মাঝে ব'সে সর্বদাই মন খুঁতখুঁত করে, যেন কত বড় অপরাধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক'রে ফেলেছি। বাইরের দৈন্য-অভাব যত ভিতরে ভিতরে চাবকাতে থাকে, তত মনটা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতে থাকে (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৯)।

নজরুল এই জায়গায় শরৎচন্দ্রের দোহাইও দিলেন। লিখিলেন, 'কথাসাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র "শনিবারের চিঠি"-ওয়ালাদের কাছে আমায় গালিই দিন আর যা-ই করুন, (জানি না এ সংবাদ সত্য কি-না) ঐ দারিদ্র্যটুকুর অসম্মান তিনি করতে পারেননি। অসহায় মানুষের দুঃখ-বেদনাকে তিনি এত বড় ক'রে দেখেছেন ব'লেই আজ তাঁর আসন রবিলোকের কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে' (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৯)।

নজরুল ইসলামের এই শরৎ-দোহাই আস্ফালন মাত্র ছিল না। প্রমাণস্বরূপ, কিছুদিন আগে (১৩ আশ্বিন ১৩৩৪) 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার 'রস-সেবায়েৎ' নামক একটি লেখার কথা বলা যায়। জনৈক ব্রজদুর্ল্লভ হাজরার লেখা ধরিয়া আলোচনা শুরু করিলেন শরৎচন্দ্র। সে বছর আশ্বিনের 'প্রবাসী' পত্রিকায় তরুণের দলকে হামলা করিয়া ঐ ভদ্রলোক একপ্রস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের মন্তব্য:

> এই ব্যক্তি ডেপুটিগিরি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে এবং আজীবন গোলামির পুরস্কার মোটা পেনশনও ইহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। তাই সাহিত্যসেবীর নিরতিশয় দারিদ্র্যের প্রতি উপহাস করিতে ইহার সঙ্কোচের বাধা নাই। লোকটি জানেও না যে, দারিদ্র্য অপরাধ নয়, এবং সর্বদেশে ও সর্বকালে ইহারা অনশনে প্রাণ দিয়াছে বলিয়াই সাহিত্যের আজ এত বড় গৌরব (চট্টোপাধ্যায় ২০১৮: ৮৫১)।

এই ভদ্রলোকের লেখা হইতে খানিক উদ্ধার করিয়া শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছিলেন ইহার ধারণা শুদ্ধ অর্থোপার্জনের জন্য বেকার সাহিত্যিকের দল গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ভদ্রলোক লিখিয়াছিলেন, 'এখন যেরূপ রাজনীতির চর্চায় শিশু ও তরুণ, ছাত্র ও বেকার ব্যক্তি সতত নিরত,' বেকার সাহিত্যিকও তদ্রূপ অর্থোপার্জনের মতলবে সাহিত্যের চর্চায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়োজিত। আর তাহার ফলে 'হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে' (উদ্ধৃত, চট্টোপাধ্যায় ২০১৮: ৮৫১)।

দরিদ্র সাহিত্যিকদের সঙ্গে শরৎচন্দ্র কোন রসিকতা করেন নাই। নজরুল জানিতেন পথের কুকুরদের জন্যও তাঁহার মনে অপর্যাপ্ত আর্দ্ররসের স্রাব হইত। প্রচার ছিল, তাহাদের জন্যও একটা ব্যবস্থা তিনি উইলযোগে করিয়া গিয়াছিলেন। এই সুবাদে এক্ষণে নজরুল ইসলামের অন্তিম প্রার্থনা দাঁড়াইল: '... যদি পরজন্ম থাকেই, তবে আর যেন এদেশে কবি হ'য়ে না জন্মাই। যদি আসি, বরং শরৎচন্দ্রের মঠের কুকুর হ'য়েই আসি যেন। নিশ্চিন্তে দু'মুঠো খেয়ে বাঁচব' (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬৩০)।

৪

বর্তমানে প্রচলিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র ভাষ্য অনুসারে, রবীন্দ্র-পরিষদের বক্তৃতায় ঠাকুর নাকি বলিয়াছিলেন, 'সেদিন কোনো একজন বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন "খুন"।' কবিতাটির কোন বাক্য কিন্তু উদ্ধার করিয়া দেখাইলেন না কবিগুরু। শুদ্ধ মন্তব্য যোগ করিলেন, 'পুরাতন "রক্ত" শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তা হলে বুঝব, সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান' (ঠাকুর ১৪২২: ৫১০)।

প্রকৃত প্রস্তাবে, রবীন্দ্রনাথের মুখনিঃসৃত বাণী পত্রপত্রিকায় প্রথমবার ছাপা হইবার সময় তাহাতে 'হিন্দু' শব্দটি ছিল না। কথাটা ছিল 'একজন বাঙালি কবির কাব্যে দেখলুম'। পরে মাসিক 'প্রবাসী' (ফাল্গুন ১৩৩৪) পত্রিকায় ছাপার জন্য কবি নিজ হাতেই বক্তৃতাটি লিখিয়া দিলেন। তাহাতে 'হিন্দু' শব্দটি যোগ করা হয়। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ঘটনা আর কিছু নয়, লুপ্ত শব্দটির পুনরুদ্ধার। হইতে পারে তাহা দ্বিতীয় চিন্তার ফল।

অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন 'হিন্দু' শব্দটি যদি 'বাঙ্গলার কথা' বা 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্রিকাতেও থাকিত তো নজরুল ইসলামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে উষ্ণ সম্পর্ক তাহা শীতল হইত না। কমসে কম নাতিশীতোষ্ণ থাকিত। হইতে পারে কথাটা সঠিক। তাহাতে বড়জোর একটি প্রশ্নের উত্তর হয়। প্রমাণ হয় রবীন্দ্রনাথের উক্তি নজরুল ইসলামকে লক্ষ্য করিয়া বক্ষ্যমাণ হয় নাই। তাহাতে বক্তব্যের হেরফের হইবে কি? হইবে না, বরং দুইটা নতুন প্রশ্নের উদয় হইবে।

সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তারা জানিতে চাহিবেন, বাণের লক্ষ্য বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি নজরুল ইসলাম না হইয়া থাকেন তো তিনি কে? কোন কাব্যে পাওয়া যাইবে সেই বাক্য যেখানে 'রক্ত' শব্দের স্থলে ব্যবহার করা হইছিল 'খুন'? এই প্রশ্নে ইতিহাস নিরুত্তর। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখিয়াছিলেন—তাহাও ঘটনার ৪২ বছর পর—'শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল জীবনানন্দ দাশ' (সেনগুপ্ত ১৯৬৯: ২৪৭)। কোথায়, কখন, ও কেন এই কথা 'শোনা' গিয়াছিল তাহার হদিশ কিন্তু সেনগুপ্ত দিলেন না। কেননা তাঁহার কর্তব্য বাদ-প্রতিবাদ নয়, মীমাংসা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত স্মৃতিকথা আর জীবনী লিখিয়া নাম করিয়াছেন। যেখানে তথ্যের প্রয়োজন সেখানে তথ্য আর যেখানে কল্পনাশক্তি প্রয়োজন সেখানে তাহা যোগাইতে তিনি তৎপর: 'কবিতায় কবিত্বের খাতিরে কোনো শব্দই যে অচ্ছুৎ নয়, শব্দের গ্রাম্যতাও যে স্থানবিশেষে কাব্যে রম্যতা আনে এ কথা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে বেশি জানেন? তবু কালের হাওয়ায়, কিংবা বলা যাক, দলের হাওয়ায়, মহাপুরুষেরাও মাঝে মাঝে বিপরীত কথা বলে থাকেন' (সেনগুপ্ত ১৯৬৯: ২৪৭)।

শেষমেশ, অচিন্ত্যকুমার একটা মীমাংসাই যোগাইয়া দিলেন। কবি তো দলের নহেন, কবি শতদলের, তাই এই সংকীর্ণ বিরোধ স্থায়ী হইল না। অচিন্ত্যকুমারের সুচিন্তিত বাক্যে: 'নজরুল তার ভুল বুঝতে পারল, রবীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে গিয়ে বসল হাসতে-হাসতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অকৃপণ আশীর্বাদের হাত রাখলেন তার মাথার উপর' (সেনগুপ্ত ১৯৬৯: ২৪৭)।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এই কিংবদন্তি অদ্যাবধি জারি আছে। আবদুল আজীজ আল-আমান, রফিকুল ইসলাম, অরুণকুমার বসু, প্রীতিকুমার মিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলেই এই কাহিনী এস্তেমাল করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য, আল-আমান ১৩৭৬: ৫৪; ইসলাম ১৯৭২: ৪৬২; বসু ২০০০: ২৫৬-৫৭; মিত্র ২০০৭: ২৮৭)।

ধরিয়া লইলাম নজরুল ইসলাম তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কোন ভুলটা? আরো ধরিলাম, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের আলোচনার নিশানা তিনি ছিলেন না, ছিলেন অন্য কেহ। সেই অন্য কেহর পরিচয়টা কি কেহ কখনো প্রকাশ করিয়াছেন? এমনকি রবীন্দ্রনাথের এস্তেকালের আশি বছর পরও কি কেউই করিয়াছেন? নজরুল ইসলামও যদি সেই বাঙালি হিন্দু কবির পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইবেন, তবে কেন তাহা প্রকাশের কোশেস করেন নাই তিনি?

সত্যের খাতিরে সকল ইতিহাসবেত্তাই স্বীকার করিবেন, নজরুল ইসলামের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধটির উত্তর দেওয়া কোনদিন কর্তব্য বিবেচনা করেন নাই রবীন্দ্রনাথ। একটা উত্তর অবশ্য দিয়াছিলেন স্বাধীন মানুষ প্রমথ চৌধুরী। কিন্তু যতটা মনে করা হয় ততটা স্বাধীন কি তিনি ছিলেন? তিনি তো রবীন্দ্রনাথের মুখপাত্রবিশেষ। অপরাধীন। সুমিতা চক্রবর্তীর কথায়, '... রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়ে উত্তর দেবার দায় গ্রহণ করলেন তাঁর স্নেহধন্য আত্মীয় ও বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, প্রমথ চৌধুরী' (চক্রবর্তী ২০০৭: ১৬৩)। 'বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা' নামক প্রমথবাবুর প্রবন্ধটি প্রকাশ পাইয়াছিল সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'তে (বর্ষ ২, সংখ্যা ৪২, ২০ মাঘ ১৩৩৪, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮)। তবে নিজ নামে নহে, 'বীরবল' ছদ্মনামে।

সুমিতা মনে করাইয়া দিয়াছেন, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন আইন পরীক্ষা পাস করা ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার মহাশয়ের যুক্তি অকাট্য, সঙ্গে সঙ্গে—সমান মাপে—অপ্রাসঙ্গিকও বটে। যে সভায় রবীন্দ্রনাথ রক্ত শব্দের জায়গায় খুন ব্যবহার অপরাধ বলিয়া দাগা দিয়াছিলেন সে সভায় তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মোটেও মনে হয় নাই যে কথাটা কাজী সাহেবকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা। তিনি মাত্র কানেই শোনেন নাই, চোখেও দেখিয়াছিলেন। আইন-আদালতেও এই জাতীয় সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা অল্প। প্রবাদে বলে, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। চৌধুরী বলিলেন, 'যতদূর মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে, কোনও উদীয়মান তরুণ কবির নবীন ভাষার উদাহরণ-স্বরূপ তিনি "খুনের" কথা বলেন। কোনও উদিত কবির প্রতি তিনি কটাক্ষ করেননি' (চৌধুরী ১৯৬৭: ৬৫৮)।

নজরুল ইসলামকে 'উদীয়মান' কবি বলা যে সমীচীন নহে! তিনি তো 'উদিত' হইয়াই আছেন গোটা 'দশ' বছর জুড়িয়া (যাহা সাত তাহাই দশ মনে হইয়াছে)—এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য চৌধুরী যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা বেশ শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার যুক্তির সামান্য নমুনা:

> সাহিত্য-জগতে তরুণ বলতে কাকে বোঝায়, তার সন্ধান আমি আজও পেলুম না। যদি আমি ও-পদবাচ্য না হই তা হ'লে কাজী সাহেবও তা নন্। কারণ, সাহিত্যিক ঠিকুজি অনুসারে আমার বয়স ষোল—আর কাজী সাহেবের দশ। সাহিত্যিকরা ত আর বিয়ের কনে নন যে, দশে ও ষোলয় বেশী তফাৎ করে (চৌধুরী ১৯৬৭: ৬৫৮-৫৯)।

সুমিতা চক্রবর্তী বলেন, 'প্রমথ চৌধুরীর যুক্তিটি কিন্তু খুব সবল ও সংশয়াতীত' নহে। তাঁহার সিদ্ধান্তের এক পা দাঁড়াইয়াছে 'উদীয়মান' আর 'উদিতে'র ব্যবধানের উপর। আর দ্বিতীয় পায়াটা নজরুল ইসলাম যে ইংরেজি ১৯২৭ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠিত—অর্থাৎ 'উদিত' কবি—এই প্রচ্ছন্ন বিচারের উপর রাখা। এখানে বলা হয়ত নিষ্প্রয়োজন নয়, প্রমথবাবু (জন্ম ১৮৬৮) রবীন্দ্রনাথের মাত্র সাত বছরের কনিষ্ঠ। আর প্রবাদ অনুসারে নজরুল ইসলামের জন্ম ১৮৯৯। অর্থাৎ তিনি রবীন্দ্রনাথের মাত্র আটত্রিশ বছর পরে ধরাপৃষ্ঠে আসিয়াছিলেন।

পরের মাসে 'উদীয়মান' আর 'উদিত' বিচারের ফাঁক হইতে রবীন্দ্রনাথ সরিয়া দাঁড়াইলেন। দুইটির একটিও এস্তেমাল না করিয়া অন্য পথ ধরিলেন তিনি। ১৩ ডিসেম্বর বক্তৃতার 'কবিকৃত অনুলেখন'—যাহা এখন আমরা 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে পাই—'প্রবাসী'তে ছাপা হয় ফাল্গুন মাসে। পরে লেখাটি 'রবীন্দ্র-পরিষদ নিষ্ক্রান্তি' আর 'রবীন্দ্র-পরিষদে কবির অভিভাষণ' ছাপ দিয়া স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্যের পথে' সংকলনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা ইহা 'কবির অভিভাষণ' নামে পাইতেছি (দ্রষ্টব্য, ঠাকুর ১৪১৪: ১৮৯-৯৬; ঠাকুর ১৪২২)।

নতুন অনুলিখনে 'হিন্দু' শব্দটি নীরবে হাজির হইল। এক্ষণে নজরুল ইসলামের আপত্তির কারণ থাকে কি! তাহা না থাকিলেও সংশয়ের কাঁটা কিন্তু থাকিয়াই গেল। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের সত্যকার অর্থাৎ মৌখিক অভিভাষণে 'হিন্দু' কথাটি ছিল। যদি পরের সপ্তাহের পত্রিকা দুইটিতে সত্য সত্য তাহাই ছাপা হইত তো কাজী নজরুলের প্রতিক্রিয়া নিছক ভুল বোঝাবুঝির ফসল বলা সহজ হইত। বিপদের কথা, 'হিন্দু' শব্দটি বাদ দিবার ষড়যন্ত্রে শুদ্ধ 'শনিবারের চিঠি'র সংরক্ষণশীল সজনীকান্ত দাস নহেন, দৈনিক 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকার সম্পাদক প্রগতিশীল প্রেমেন্দ্র মিত্রও জড়িত। জানা কথা, রাজনীতির দিক হইতে 'শনিবারের চিঠি' ও 'বাঙ্গলার কথা' এক গোষ্ঠীর পত্রিকা ছিল না। প্রেমেন্দ্রকে বরং গণ্য করা হইত সজনীকান্তের প্রতিপক্ষ। সুমিতা চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, 'বিশেষত, প্রেমেন্দ্র মিত্র নজরুলের বন্ধু ছিলেন এবং সজনীকান্তের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের ঝগড়া বাধাবার চেষ্টায় তিনি সজনীকান্তের সঙ্গে সামিল ছিলেন এমন অনুমান খুব যুক্তিসিদ্ধ নয়' (চক্রবর্তী ২০০৭: ১৬৫)।

সুমিতা চক্রবর্তী কঠোর হইয়াছেন প্রথম চৌধুরীর উপর। তিনি বলিয়াছেন, চৌধুরী যে তাঁহার লেখায় এই 'হিন্দু' শব্দটির প্রসঙ্গ মোটেও আনেন নাই সেই তথ্যটি তো সবার চেয়ে বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে। চৌধুরী যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়ছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের উক্তির লক্ষ্য নজরুল নহেন, অন্য কেহ। সুমিতা চক্রবর্তী লিখিলেন: 'যদি এমন অমোঘ একটি অস্ত্র থাকত রবীন্দ্রনাথের ভাষণেই তাহলে সেটি কি ব্যবহার করতেন না প্রমথ চৌধুরী? তাহলে এক কথাতেই সব সংশয়ের নিরসন ঘটত। তার বদলে "উদীয়মান" আর "উদিত" নিয়ে একটা তর্ক তুললেন তিনি। অথচ রবীন্দ্রনাথের লেখাটিতে উক্ত শব্দ দুটির কোনোটিই নেই' (চক্রবর্তী ২০০৭: ১৬৫)।

সুমিতার সিদ্ধান্ত তাই সুমিতচিন্তার পরিচয়ই বহন করিতেছে: 'কাজেই এমন একটি সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না—রবীন্দ্রনাথের ভাষণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হিন্দু" শব্দটি সত্যিই ছিল না। "শনিবারের চিঠি" আর "বাঙ্গালার কথা"য় ভাষণের অংশ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে আবর্তের সৃষ্টি হল তা প্রশমিত করবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ তিন মাস পরে মুদ্রিত তাঁর প্রবন্ধে "হিন্দু" শব্দটি যোগ করে দিলেন।' অতঃপর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুমিতা বলিলেন, '"দ্বিতীয় চিন্তা"র বশবর্তী হয়ে এমন কাজ তিনি মাঝে মাঝে করতেন' (চক্রবর্তী ২০০৭: ১৬৫)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অভ্যাস বিষয়ে আরো একটি তথ্য উপস্থিত করিয়াছেন সুমিতা। ১৯২৩ সালে নজরুল ইসলামের অনশনের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নামে 'অনশন ত্যাগ কর। আমাদের সাহিত্যে তোমার প্রয়োজন রহিয়াছে' বলিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন—এমন কিংবদন্তি আজও চালু আছে। সেই টেলিগ্রামটির কপি এতদিনে কাহারো হাতে নাই। প্রমাণের মধ্যে আছে একা রবীন্দ্রনাথের লেখা একখানা চিঠি। চিঠিটি কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরাবর লেখা। নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা ভর করিয়া সুমিতা চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, 'নজরুলের জন্য রবীন্দ্রনাথের এই উদ্বেগ অকৃত্রিম। কিন্তু সম্ভবত সম্পূর্ণ স্বতোৎসারিত নয়' (চক্রবর্তী ২০০৭: ১৬৭, টীকা)।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল নজরুলের অনশন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। তিনি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন, 'আদর্শবাদীকে আদর্শ ত্যাগ করতে বলা তাকে হত্যা করারই সামিল। অনশনে যদি কাজীর মৃত্যুও ঘটে তাহলেও তার অন্তরের সত্য ও আদর্শ চিরদিন মহিমময় হয়ে থাকবে' (উদ্ধৃত, চক্রবর্তী ২০০৭: ১৬৭-৬৮, টীকা)।

স্বয়ং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, অনেকদিন পর রবীন্দ্রনাথের নিকটেই তিনি জানিতে পারেন যে ঐ চিঠি লেখার পর কোন এক সময় কবি নিজ মতামত বদলাইয়া সেন্ট্রাল জেলে তার করিয়াছিলেন। এদিকে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চিঠি হইতে জানিতে পারা যায় যে কবিগুরু টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলের ঠিকানায়। জেল হইতে মেমো আসিয়াছে, উদ্দিষ্টকে পাওয়া যাইতেছে না। কবি লিখিয়াছিলেন, 'অর্থাৎ ওরা আমার বার্তা ওকে দিতে চায় না, কেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না নজরুল প্রেসিডেন্সি জেলে না থাকলেও ওরা জানে সে কোথায় আছে। অতএব নজরুল ইসলামের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না' (উদ্ধৃত, চক্রবর্তী ২০০৭: ১৬৭, টীকা)।

এই জায়গায় সুমিতা চক্রবর্তী ঘটনার গোড়ায় হাত দিলেন। তিনি কবুল করিলেন, রবীন্দ্রনাথ সত্য সত্যই নজরুলকে লক্ষ্য করিয়া 'খুন' কথাটির নিন্দা করেন নাই। 'সত্যিই কোনো হিন্দু কবির কথাই তাঁর মনে এসেছিল। হয়তো মুসলমান নজরুলের লেখায় "খুন" শব্দের ব্যবহার তাঁর স্বাভাবিক মনে হত কিন্তু হিন্দু কবির বাগ্‌ভঙ্গির ক্ষেত্রে শব্দটি লেগেছিল বেমানান' (চক্রবর্তী ২০০৭: ১৬৫)।

চক্রবর্তীর অনুমানের ভিত্তি বছর দুই আগে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরেকটি প্রবন্ধ। 'সাহিত্যসম্মিলন' নামধেয় প্রবন্ধটি ১৩৩২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের 'শিউড়ি' অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতা আকারে আগাম লেখা হইয়াছিল। বৈশাখ ১৩৩৩ সালে ছাপা সেই ভাষণে তিনি বাঙালি মুসলমানের ভাষা লইয়া অনেক বাক্যব্যয় করেন:

> সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়ের অধিক-সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠেসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি। চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলে না যে, চীনভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের মুসলমানির খর্বতা ঘটিবে। বস্তুতই খর্বতা ঘটে যদি জবরদস্তির দ্বারা তাহাদিগকে ফার্সি শেখাইবার আইন করা হয়। বাংলা যদি বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা হয়, তবে সেই ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে। বর্তমান বাংলাসাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী তাঁহারা এই ভাষাতেই অমরতা লাভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিবেন। শুধু তাই নয়, বাংলাভাষাতে তাঁহারা মুসলমানি মালমসলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরো জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলাভাষার মধ্যে তো সেই উপাদানের কমতি নাই—তাহাতে আমাদের ক্ষতি হয় নাই তো (ঠাকুর ১৪১৪: ১৮৫-৮৬)।

চক্রবর্তী লিখিলেন: 'দেখা যাচ্ছে, মুসলমান লেখকরা যদি বাংলা ভাষায় "মুসলমানি মালমসলা" বাড়িয়ে দেন তাতে আপত্তি নেই রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু হিন্দু লেখকের ক্ষেত্রে বোধহয় মন থেকে সায় দিতে পারেননি তিনি। একটু অদ্ভুত মনোভাব, সন্দেহ কী? একটি শব্দ হিন্দু বাঙালি ব্যবহার করলে আপত্তি, মুসলমান বাঙালি ব্যবহার করলে আপত্তি নেই' (চক্রবর্তী ২০০৭: ১৬৬)।

এই অদ্ভুত ব্যাপারটি ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে খুব 'স্বাভাবিক'—অন্তত খুব 'অস্বাভাবিক' নহে। সিদ্ধান্তটা সুমিতা চক্রবর্তীর। তিনি যুক্তি দেখাইতেছেন, রবীন্দ্রনাথের এহেন মনোভাবকে কেন খুব অস্বাভাবিক বলা যায় না।

> হিন্দু কবির লেখায় 'খুন' শব্দটি নিয়েই আপত্তি ছিল তাঁর বিশেষভাবে। কিন্তু বক্তৃতায় 'হিন্দু' শব্দটি বলা হয়নি। মাঝে থেকে গোলমাল পাকিয়ে উঠল নজরুলের ক্ষোভের কারণে। তখন রবীন্দ্রনাথ লিখিত আকারে প্রবন্ধটি প্রকাশ করবার সময়ে 'হিন্দু' শব্দটি বসিয়ে দিতে দ্বিধা করলেন না। কেন করবেন? শব্দটা তাঁর মনের মধ্যে তো ছিলই! 'প্রবাসী'-র সম্পাদকের পরামর্শ ছিল কি না তা আর এখন জানা যাবে না (চক্রবর্তী ২০০৭: ১৬৬)।

পরিশেষে 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা'র রায় বিভক্ত আকারে দিতে বাধ্য হইলেন সুমিতা চক্রবর্তী। এক নম্বর প্রশ্নের দায় হইতে রবীন্দ্রনাথকে খালাস দিলেন তিনি। প্রশ্নটি বিশেষ প্রশ্ন। বলিলেন, বক্তৃতায় 'হিন্দু' শব্দটি বলা হয় নাই—এ কথা সত্য বটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে শব্দটি আদিতেই উপস্থিত ছিল। তিন মাস পরে উহা বাহিরে আসিয়াছে। এক কথায়, তিনি নজরুল ইসলামকে কটাক্ষ করেন নাই। সুতরাং নজরুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামের ক্ষোভ অকারণ। জয়তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বীকার করিতেই হইবে, 'নীরব কবিত্ব' বলিয়া একটি জিনিশ সত্য সত্য আছে।

দুর্ভাগ্যের মধ্যে, এই মামলায় রায়ের অপেক্ষায় রহিয়াছে আরো একটি প্রস্তাবঃ হিন্দু বা মুসলমান বিশেষের ভাষায় নহে, নির্বিশেষ সর্বজনের বাংলায় 'খুন' শব্দটি—বা সমজাতীয় বিদেশি কোন শব্দ—ব্যবহার করা চলিবে কি চলিবে না। সুমিতা চক্রবর্তীর সিদ্ধান্ত, 'এই প্রচলনের পক্ষে প্রসন্ন সমর্থন ছিল না রবীন্দ্রনাথের।' সুতরাং দুই নম্বর অভিযোগ হইতে ঠাকুরকে অব্যাহতি দেওয়ার সুযোগ রহিল না। চক্রবর্তীর বক্তব্যঃ 'রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে লক্ষ করে না বললেও মূল কথাটা থেকেই যাচ্ছে যে, বাঙালি হিন্দুর লেখা বাংলা কবিতায় "খুন" শব্দের প্রয়োগে একটু আপত্তিই ছিল তাঁর' (চক্রবর্তী ২০০৭ঃ ১৬৬)।

সুমিতা পরিষ্কার জানাইতেছেন, এই জাতীয় প্রস্তাবে—তাহা এমনকি ঠাকুরের হইলেও—একবিন্দু সমর্থন দেওয়া ঠিক হইবে না। তাঁহার কথায়, হিন্দু কবি 'খুন' লিখিতে পারিবেন না আর মুসলমান কবি পারিবেন—এহেন প্রস্তাব 'বিজ্ঞানসম্মত' নহে এবং কিছুটা 'বিপজ্জনক'ও বটে।

বিপদের কথাটা কোথায়? বিদেশি শব্দের আপদে নহে, বিপদটা স্বদেশি মনের সাম্প্রদায়িক ব্যবহারে। সুমিতাদেবীর প্রশ্নঃ 'সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথ অথবা অন্য কেউ এমন চাইবেন যে, হিন্দু বাঙালির কাব্যভাষা আর মুসলমান বাঙালির কাব্যভাষার মধ্যে চরিত্রগত কোনো পার্থক্য থাকা উচিত' (চক্রবর্তী ২০০৭ঃ ১৬৭)?

এই প্রশ্নের আগেই উত্তরস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যে বিবৃতি দান করিয়াছিলেন তাহা অতীব দুর্ভাগ্যজনক।

৫

'খুনের মামলা' রুজু করিবার বছর দুই আগে খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেনঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এইখানে আমাদের আদানে প্রদানে জাতিভেদের কোনো ভাবনা নাই। সাহিত্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ থাকিত তবে গ্রীকসাহিত্যে গ্রীকদেবতার লীলার কথা পড়িতে গেলেও আমাদের ধর্মহানি হইতে পারিত। মধুসূদন দত্ত খৃস্টান ছিলেন। তিনি শ্বেতভুজা ভারতীর যে বন্দনা করিয়াছেন সে সাহিত্যিক বন্দনা, তাহাতে কবির ঐহিক পারত্রিক কোনো লোকসানের কারণ ঘটে নাই। একদা নিষ্ঠাবান হিন্দুরাও মুসলমান আমলে আরবি ফারসি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের ফোঁটা ক্ষীণ বা টিকি খাটো হইয়া যায় নাই। সাহিত্য পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রের মতো, সেখানকার ভোজে কাহারো জাতি নষ্ট হয় না (ঠাকুর ১৪১৪: ১৮৭)।

একটু আগেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, বাংলা সাহিত্য 'আমাদের সৃষ্টি'। মানে নতুন যুগের বাংলা সাহিত্য বাঙালির 'নূতন সৃষ্টি'—'ইহা আমাদের দেশের পুরাতন সাহিত্যের অনুবৃত্তি নয়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ধারা যে খাতে বহিত বর্তমান সাহিত্য সেই খাতে বহে না' (ঠাকুর ১৪১৪: ১৮২)। এই নতুন বাংলা সাহিত্য লইয়াই তো হিন্দুতে-মুসলমানে বিরোধ। এই কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন। 'কিন্তু,' তিনি হলপ করিলেন, 'দুই তরফের কেহই এ কথা বলিতে পারেন না যে এটা ভালো' (ঠাকুর ১৪১৪: ১৮৭)।

রবীন্দ্রনাথ ভাল করিয়াই জানেন যে বিরোধ শুদ্ধ হিন্দুতে-মুসলমানেই নহে, হিন্দুতে-হিন্দুতেও, মুসলমানে-মুসলমানেও। ইহার ভিতর হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যকার বিরোধটাই সমাধানের সীমানা পার হইয়া গেল। জিজ্ঞাস্য এখানেই।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই সাক্ষ্য দিয়াছেন, বাংলাদেশে এমন অনেক হিন্দুও আছেন যাঁহারা মনে করিতেন, 'ভারতের ঐক্যসাধনের উপায়স্বরূপে অন্য কোনো ভাষাকে আপন ভাষার পরিবর্তে বাঙালির গ্রহণ করা উচিত ছিল।' নাম উচ্চারণ না করিয়াই তিনি এই প্রস্তাব-প্রবক্তার পরিচয় দিয়াছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাদের দেশের স্বাদেশিকতার একজন লোকপ্রসিদ্ধ নেতা' বলিয়া। ঐ নেতা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বাংলাসাহিত্য যে ভাবসম্পদে এমন বহুমূল্য হইয়া উঠিতেছে, দেশের পক্ষে তাহা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। অর্থাৎ, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই কারণে বাঙালির মমত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে—সাধারণ দেশহিতের উদ্দেশেও বাঙালি এই কারণে নিজের ভাষাকে ত্যাগ করিতে চাহিবে না।' ঠাকুর বলিলেন, 'দেশের ঐক্য ও মুক্তিকে যাঁহারা বাহিরের দিক হইতে দেখেন, তাঁহারা এমনি করিয়াই ভাবেন' (ঠাকুর ১৪১৪: ১৮৪-৮৫)।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের যে মুসলমানেরা 'বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন' তাহাদের দিকেও নজর নিক্ষেপ করিয়াছেন। বলিয়া রাখিয়াছেন, 'এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব' (ঠাকুর ১৪১৪: ১৮৫)।

রবীন্দ্রনাথ যদি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতেন তো জানিতেন, যে যুক্তিতে 'স্বাদেশিকতার একজন লোকপ্রসিদ্ধ নেতা' বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষা (ধরা যাইতে পারে হিন্দুস্তানি বা হিন্দি ভাষা) বাঙালির গ্রহণ করা উচিত বলিয়া যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, ঠিক সেই যুক্তিতেই 'বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান' ও বাঙালি মুসলমানের 'মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত' হইয়াছিলেন। যুক্তিটা একই, তবে একজনের বেলায় যাহা 'ভারতের ঐক্যসাধনের উপায়' আর কয়েকজনের বেলায় তাহা 'ভারতের মুসলমান সমাজের ঐক্যসাধনের উপায়'।

রবীন্দ্রনাথের চোখে এই উপায়-সন্ধানটাই ছিল 'আত্মঘাতকর প্রস্তাব'। তিনি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন: 'হিন্দুর প্রতি বিরক্ত হইয়া, ঝগড়া করিয়া, যদি সত্যকে অস্বীকার করা যায়, তাহাতে কি মুসলমানেরই ভালো হয়। বিষয়-সম্পত্তি লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পরকে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু ভাষাসাহিত্য লইয়া কি আত্মঘাতকর প্রস্তাব কখনো চলে' (ঠাকুর ১৪১৪: ১৮৬)।

এই প্রার্থনার একটু আগেই কবি জানাইয়াছেন, বাংলা ভাষার মধ্য দিয়াই মুসলমান লেখকদের 'মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে,'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর 'বাংলাভাষাতে তাঁহারা মুসলমানি মালমসলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরো জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন' (ঠাকুর ১৪১৪: ১৮৬)।

প্রশ্ন দুইটা। প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, 'মুসলমানি মালমসলা' কি জিনিশ? তাহার উপর জিজ্ঞাস্য: মশলার পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে কি বাংলা আর বাংলাই থাকে না, হইয়া ওঠে 'মুসলমানি বাংলা'?

৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে বলিবার মতন একটি কথাও মজুত আছে আমাদের হাতে। 'খুন' কথাটা 'মুসলমানি' বলিয়া তিনি আপত্তি করেন নাই; আপত্তির কারণ শব্দটি 'নূতন'। নূতন হইলে দোষ কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সাহিত্য পদার্থটা ক্ষণকালের নহে, চিরকালের বস্তু। তাঁহার কথায়, যাহা শুদ্ধ ক্ষণকালের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ তাহা 'নূতন' আর যাহা চিরকালের সহিত আত্মীয়তা পাতাইয়াছে তাহার নাম 'নবীন'। কবির যে অভিভাষণ লইয়া এখনো আলোচনা হইতেছে সে অভিভাষণে বলা হইয়াছিল, 'নবযুগ একটা কথা মাঝে মাঝে ভুলে যায়— তার বুঝতে সময় লাগে যে, নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত।' ধর্মভেদের মঞ্চে দাঁড়াইয়াই মাত্র রবীন্দ্রনাথ নবীনধর্মের ইশতেহার পড়িতে সমর্থ হইলেন। বলিলেন, 'নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে' (ঠাকুর ১৪২২: ৫১০)।

তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন রক্ত শব্দটা পুরাতন হইলেও (অথবা পুরাতন বলিয়াই) নবীন আর খুন কথাটা শুদ্ধ নতুনই। সে মাত্র 'অকস্মাতের খোঁচা দিতে' আসিয়াছে। রক্ত লিখিয়া কোন হিন্দু কবি যদি আপনকার কাব্যে 'রঙ' লাগাইতে না পারেন তো রবীন্দ্রনাথের বিচারে সেটা সেই হিন্দু কবিরই 'অকৃতিত্ব'। আর খুন শব্দটা লিখিয়া আলোচ্য কবিটি মৃদু নহে এমন—অর্থাৎ প্রবল—তাক লাগাইতে চাহিতেছেন বলিয়া ধরিতে হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিশ্বাসের মধ্যে ভূত অর্থাৎ অতীত আছে। সুমিতা চক্রবর্তী এই প্রশ্নটা তুলিবার অবকাশ পান নাই। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলিয়াছেন, 'এইরকম নতুন' হইবার জন্য যাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা, যাঁহারা 'উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের তরুণ ব'লে ঘোষণা করেন,' তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে। তাঁহাদিগকে 'তরুণ' বলিতেই রাজি নহেন তিনি। রবীন্দ্র-পরিষদের অভিভাষণে তাঁহার সুস্পষ্ট ঘোষণা:

> আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাঁদের উষাকে নিয়ুমার্কেটে 'খুন' ফরমাশ করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক। আর যে-বৃদ্ধদের মরচে-ধরা চিত্তবীণায় পুরাতনের স্পর্শে নবীন রাগিণী বেজে ওঠে না তাঁদের সঙ্গে আমার মিল হবে না, তাঁদের বয়স নিতান্ত কাঁচা হলেও (ঠাকুর ১৪২২: ৫১০-১১)।

তিনি যোগ করিলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদ 'সকল বয়সের সেই তরুণদের পরিষদ হোক, পুরাতনের নবীনতা বুঝতে তাঁদের যেন কোনো বাধা না থাকে।' চিরন্তনতার নামে নতুনের বিরোধিতা করা অথবা চিরন্তনকে নবীন নামে পরিবেশন করায় ঠাকুরের ক্লান্তি ঘটে নাই।

এয়ুরোপ মহাদেশে বিশ শতকের গোড়ায় যে সকল আন্দোলন শিল্প ও সাহিত্যকর্মীদের আলোড়িত করে তাহাদের সামনে রাখিয়াই রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলি আওড়াইয়াছিলেন। 'ডাডায়িজ্‌ম্' নামধেয় সাহিত্যান্দোলনের নামে তিনি—'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে—ঘোষণা করিয়াছিলেন, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মারিয়া, চমক লাগাইয়া দেওয়াই 'সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ' হইতে পারে না। চরম—এ সত্যে সন্দেহ নাই, তবে ঠাকুরের অভিধানে সে চরম অপকর্ষের মাত্র, উৎকর্ষের নহে। ঠাকুর লিখিয়াছেন, 'সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজ্‌ম্' (ঠাকুর ১৪১৪: ৮৬)। তাঁহার জবানিতেই শুনি তাঁহার আশঙ্কাটা কোথায় বা কি কারণে:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এই, আলাপের সহজ শক্তি যখন চলে যায় সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে। বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রলাপের জোর আলাপের চেয়ে অনেক বেশি এ কথা মানতেই হয়। কিন্তু তা নিয়ে শঙ্কা না করে লোকে যখন গর্ব করতে থাকে তখনই বুঝি, সর্বনাশ হল বলে (ঠাকুর ১৪১৪: ৮৬)।

অভিভাষণে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন তিনি: 'সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনই মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে' (ঠাকুর ১৪২২: ৫১০)।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস আর ব্যবহারে একেবারেই মিল নাই—এমন অভিযোগ মনে হয় তাঁহার পরম শত্রুও করিবেন না। তাঁহার বিশ্বাসের তালিকা দীর্ঘ। আপাতত আমরা সেই তালিকার তিনটা কথা ধরিতে পারিয়াছি। প্রথম কথা, তিনি পক্ষপাতী চিরন্তনের। চিরন্তনই যুগে যুগে 'নবীন' নাম ধারণ করে। তবেই না তাহার 'কুলীন' পরিচয়। সে পরিচয় চিরন্তন। একটা উদাহরণ: 'কবির অভিভাষণে'ই আমরা পড়ি:

ক্ষণকালের তুচ্ছতা থেকে, জীর্ণতা থেকে, নিত্যকালের আনন্দরূপকে আবরণমুক্ত ক'রে দেখাবার ভার কবির। সংসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অঙ্কে নানাপ্রকার কাজের লোক নানাপ্রকার প্রয়োজনসাধনে প্রবেশ করেন; কিন্তু কবি আসেন 'পঞ্চমঃ'; আশুপ্রয়োজনের সদ্যঃপাতী আয়োজনের যবনিকা সরিয়ে ফেলে অহৈতুকের রসস্বরূপকে বিশুদ্ধ ক'রে দেখাতে (ঠাকুর ১৪২২: ৫০৭)।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কথা আনন্দের সঙ্গে জড়িত। আমাদের সাহিত্য বা শিল্প অমৃতের রস বা চিরকালের সামগ্রী বলিয়াই তাহার কাজ আনন্দ দেওয়ার অধিক হইতে পারে না। তিনি একটি সংস্কৃত অমৃতবাণী বলিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণে গন্ধে, রূপে সংগীতে নৃত্যে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে। কবির কাব্যেও সেই বাণীরই ধারা' (ঠাকুর ১৪২২: ৫০৮)। ঠাকুর সততার সহিত লিখিয়াছেন:

> একজন য়ুরোপীয় আর্টিস্টকে একদিন বলেছিলুম যে, ইচ্ছা করে ছবি আঁকার চর্চা করি, কিন্তু আমার দৃষ্টি ক্ষীণ ব'লে চেষ্টা করতে সাহস হয় না। তিনি বললেন, 'ও ভয়টা কিছুই নয়, ছবি আঁকতে গেলে চোখে একটু কম দেখাই দরকার; পাছে অতিরিক্ত দেখে ফেলি এই আশঙ্কায় চোখের পাতা ইচ্ছে ক'রেই কিছু নামিয়ে দিতে হয়। ছবির কাজ হচ্ছে সার্থক দেখা দেখানো; যারা নিরর্থক অধিক দেখে তারা বস্তু দেখে বেশি, ছবি দেখে কম' (ঠাকুর ১৪২২: ৫০৯)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই প্রস্তাবের সমর্থন পাই তাঁহার প্রায় সমকালীন জার্মান বাল্টার বেনিয়ামিনের লেখাতেও। বেনিয়ামিন চিত্রকরের সহিত তুলনা করিয়াছেন জাদুকর বা ঝাড়ফুঁক দেওয়া বৈদ্য কিংবা ওঝার। জাদুকর আর চিত্রকর উভয়েই রোগী বা বস্তুকে খানিক দূর হইতে দেখিবেন বৈকি। অন্যদিকে চলচ্চিত্রকার, আলোকচিত্রকার কিংবা শল্যচিকিৎসকও বস্তুর কিংবা রোগীর ভিতরটা দেখিতে কি আরো কাছে আসিতে গ্রীবা উঁচু করিয়া থাকেন।

তাঁহারা কে কি দেখেন তাহার ব্যবধান এক কথায় আকাশ-পাতাল। জাদুকর দেখেন আকাশ। রবীন্দ্রনাথ কবিকে এই দলে ফেলিলেন। বলিলেন তিনি 'জমিদার' যতটা, তাহার বেশি 'আসমানদার'। মহাজনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরাও বলিতে পারি চলচ্চিত্রকার, আলোকচিত্রকার কিংবা শল্যচিকিৎসক একেকজন পাতালদার।

বেনিয়ামিন সেই সময়—১৯৩৫ হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে—বলিয়াছিলেন, 'দুই জাতীয় ছবির প্রভেদ আকাশ-পাতাল। চিত্রকরের ছবি সবটুকু একসঙ্গে দেখে। আর চলচ্চিত্রকারের ছবি দেখে খণ্ড খণ্ড করিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর ছবির নানান টুকরা জোড়া দেয় নয়া কানুন বাঁধিয়া' (বেনিয়ামিন ২০০২: ১১৫-১৬; বেনিয়ামিন ২০০৬: ২৬৩-৬৪)।

রবীন্দ্রনাথ অনেক দূর পর্যন্ত দেখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের মধ্যে, পথের সমস্ত দূরত্ব দেখা তাঁহার পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র, কিংবা শল্যচিকিৎসার বিকাশকে কেহ যদি 'নবীন' বলিয়া অভিবাদন না করেন, বরং বলেন 'নতুন' মাত্র, আমাদের কি বলিবার থাকিতে পারে! সমস্যার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের যুক্তি দাঁড়ায় শুদ্ধ বুদ্ধির বাগানে—একমাত্র নবীন-নতুন ভেদজ্ঞানে। সত্যের সহিত তাহার কোন পরিচয় ঘটে নাই।

> মহারাজা-বাহাদুর আকাশে যে-জয়ধ্বজা ওড়ান আজ সে নতুন, কাল সে পুরানো। কিন্তু সূর্যের রথে যে অরুণধ্বজা ওড়ে কোটি কোটি যুগ ধ'রে প্রতিদিনই সে নবীন। একটি বালিকা তার স্বাক্ষরখাতায় আমার কাছ থেকে একটি বাংলা শ্লোক চেয়েছিল। আমি লিখে দিয়েছিলুম—
>
> নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন,
> যুগে যুগে বর্তমান সেই তো নবীন।
> তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে নূতনের সুরা,
> নবীনের নিত্যসুধা তৃপ্তি করে পুরা।
>
> (ঠাকুর ১৪২২: ৫১০)

ঠাকুর মনে করিতেন, এয়ুরোপখণ্ডের সাহিত্যে ও চিত্রকলায় 'ডাডায়িজ্‌ম্' প্রভৃতি 'বিহ্বলতা' যে 'ক্ষণে ক্ষণে ও স্থানে স্থানে বীভৎস' হইয়া উঠিয়াছে তাহা নতুনের নিদর্শন মাত্র, নবীনের প্রমাণ নহে। তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'এটা হয়তো একদিন কেটে যাবে, যেমন করে বলিষ্ঠ লোক মারাত্মক ব্যামোকেও কাটিয়ে ওঠে' (ঠাকুর ১৪১৪: ৮৭)।

ঠাকুর আবিষ্কৃত তৃতীয় জিনিশটার পরিচয় আমরা আগেই লইয়াছি। তিনি মনে করিতেন, 'নতুন' হইয়া উঠিবার প্রাণপণ চেষ্টা দেশভেদে অধিক দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। বাংলাদেশ হয়ত সেই দুঃখের জন্মভূমি। কেননা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা দুর্বল, পরাধীনতা আমাদের বিধিলিপি। কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা বারবার উদ্ধার করিবার যোগ্য: 'ভাবনার বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের শাস্ত্রমানা ধাত। এইরকম মানুষরা যখন আচার মানে তখন যেমন গুরুর মুখের দিকে চেয়ে মানে, যখন আচার ভাঙে তখনো গুরুর মুখের দিকে চেয়েই ভাঙে' (ঠাকুর ১৪১৪: ৮৭)।

একে তো ছোঁয়াচে রোগ, তাহার উপর লোক দুর্বল। কবি দুঃখে ভয়ানক চিন্তিত: 'আমার ভয়, দুর্বলকে যখন ছোঁয়াচ লাগবে তখন তার অন্যান্য নানা দুর্গতির মধ্যে এই আর-একটা উপদ্রবের বোঝা হয়তো দুঃসহ হয়ে উঠবে' (ঠাকুর ১৪১৪: ৮৭)।

৭

আমরা দেখিয়াছি, 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা'র 'অন্তিম রায়' ঘোষণা উপলক্ষে দুই দফা সিদ্ধান্ত জানাইয়াছিলেন সুমিতা চক্রবর্তী। প্রথম দফায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, তিনি হয়ত নজরুল ইসলামকে মনে রাখিয়া 'খুন' ব্যবহারে নিষেধ করেন নাই, করিয়াছিলেন অন্য কবির কথা ভাবিয়া। অন্য কবির পরিচয় নির্দেশ না করিয়াও চক্রবর্তী কবুল করিতে রাজি রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত কবিটি হয়ত কোন অজানা 'হিন্দু' কবিই হইবেন। দুঃখের বিষয়, এই সিদ্ধান্ত দুর্বল।

দ্বিতীয় দফায় সুমিতা যাহা জানাইলেন তাহা, খোদ তাঁহার ভাষায়, ছোট মুখে বড় কথার শামিল—'এত বড়ো একটি কথা'! যাহা নজরুল ইসলামের বেলায় স্বাভাবিক তাহা কোন হিন্দু কবির বাগ্‌ভঙ্গিতে কি ভাষায় বেমানান! তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফায় ভাষা সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তুলিলেন। তিনি লিখিলেন, 'ভাষার সাম্প্রদায়িকতাও বড়ো ভয়ঙ্কর! আমরা অসতর্কভাবে তার অধীন হয়ে পড়ি' (চক্রবর্তী ২০০৭: ১৬৬)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল ইসলামের নাম যেমন মুখে লয়েন নাই তেমনি তাঁহার অনুমিত 'হিন্দু' কবির নামটিও জিহ্বায় তোলেন নাই। অনুমানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশিদূর যাইবার উপায় নাই। প্রশ্ন উঠিবে: খুন শব্দে আপত্তিটা যখন তিনি তুলিয়াছিলেন তখন তুলিয়াছিলেন শব্দটা নিছক মুসলমানি বলিয়া নহে, উহা নিতান্ত স্বতন্ত্র বা 'নতুন' বলিয়া। এক্ষণে আমরা কেন দেখিব না এই দ্বিতীয় আপত্তিটা যুক্তিগ্রাহ্য কিনা? আমরা অন্যত্র দেখিয়াছি, শিল্পকলা আর সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাও সর্বজনীন সত্য নহে, তাহাও বিশেষ ধারণাই। নির্বিশেষ কি চিরন্তন ধারণা বলিয়া আদতে কিছু নাই।

বাল্টার বেনিয়ামিন দেখাইয়াছেন, কিছু কিছু ধারণার উপর ভর করিয়া এয়ুরোপে ফ্যাসিবাদ—যাহার একটা অর্থ 'চিত্তাকর্ষক'—মতবাদটা ডাঙ্গা পাইয়াছিল। আমরা জানি ফ্যাসিবাদের 'ফ্যাসি' আর ইংরেজি 'ফ্যাসিনেটিং' বা চিত্তাকর্ষক শব্দের 'ফ্যাসি' একই শব্দ। দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের চিরন্তনতা, সমগ্রতা অথবা নতুন প্রবর্তনা মানে অসুস্থতা প্রভৃতি প্রস্তাবও ফ্যাসিচিন্তা ছাড়াইয়া যায় নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাহিত্যধর্ম' ও 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধের সহিত এয়ুরোপে প্রচারিত ফ্যাসিবাদ নামক চিন্তাধারার পার্থক্যটা কোথায়? উত্তর: সুমিতা চক্রবর্তীর ব্যাখ্যা সত্য হইলে, পার্থক্য বিশেষ নাই।

প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের 'স্নেহধন্য আত্মীয়'। কথাটার মেধাস্বত্ব সুমিতা চক্রবর্তীর। শুদ্ধ আত্মীয়তার কারণেই নহে, ভাষা বিষয়েও প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। সুমিতার ধারণা, 'বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উত্তর দেওয়ার দায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের প্রশ্ন, তাঁহার জবাব কি দায়সারার অধিক কিছু হইয়াছিল? চৌধুরী প্রমাণ করিতে প্রাণান্ত হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় 'খুন' চলিবে না—এমন কথা আদৌ বলেন নাই। তারপর তিনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তাহা তো রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষেরই কথা।

নজরুল ইসলাম লিখিয়াছিলেন, 'এই আরবী-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ক'রে গেছেন' (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৬)। এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিলেন প্রমথ চৌধুরী: 'বাংলা কবিতায় যে "খুন" চলছে না, এমন কথা আর যেই বলুন রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না, কারণ, কাজী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেব এ পৃথিবীতে আসবার বহু পূর্বে নাবালক ওরফে বালক রবীন্দ্রনাথ "বাল্মিকী-প্রতিভা" নামক যে কাব্য রচনা করেছিলেন, তার পাতা উল্টে গেলে "খুনে"র সাক্ষাৎ পাবেন। কিন্তু এসব খুন এত বেমালুম খুন যে, হঠাৎ তা কারও চোখে পড়ে না' (চৌধুরী ১৯৬৭: ৬৫৯)।

এদিকে নজরুল ইসলাম উদাহরণযোগে লিখিতেছেন:

> কবিগুরুর চিরন্তনের দোহাই নিতান্ত অচল। তিনি ইটালিকে উদ্দেশ্য ক'রে এক কবিতা লিখেছেন। তাতে—'উতারো ঘোমটা' তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি। 'ঘোমটা খোলা' শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। 'উতারো ঘোমটা' আমি লিখলে হয়ত সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীই হতাম। কিন্তু 'উতারো' কথাটা যে জাতেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সঙ্গীত ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে ও-জায়গাটায়, তা' ত কেউ অস্বীকার করবে না (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৬-২৭)।

এতক্ষণে প্রমথ চৌধুরীর পরের ওজরটি আর প্রাসঙ্গিক থাকে না। নজরুল ইসলাম বলিতেছেন, ঠাকুর নিজেও তো ঢের আরবি-ফারসি বা নতুন বানোয়াট শব্দ ব্যবহার করিতেন। অন্যদের ব্যবহারের দ্বার তিনি রুদ্ধ করিতে চাহিবেন কেন? উত্তরে প্রমথ চৌধুরী লিখিয়াছেন:

> তার পর কাজী সাহেব এই ব'লে দুঃখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার অন্তরে আরবী-ফার্সি শব্দের প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করতে চান। কাজী সাহেবের এ বিলাপ প্রলাপ মাত্র। কেননা, যদি তাঁর ও-রকম কোনও কুমতলব থাক্‌ত তা'হলে তিনি বহু পূর্বে আমার ভাষার উপর খড়্গহস্ত হতেন। বীরবলী ভাষা যে সাহিত্যে একঘরে, এমনকি সংবাদপত্রে ও আর পাঁচজনের ভাষার সঙ্গে এক পংক্তিতে তা বসতে পারে না, তার প্রধান কারণ যে সে ভাষা শব্দ সম্বন্ধে untouchability মানে না (চৌধুরী ১৯৬৭: ৬৫৯)।

প্রমথ চৌধুরীর কথা তো নজরুল ইসলামেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। একটু আগেই আমরা দেখিয়াছি নজরুল বলিতেছেন, তিনি অনেক দিন ধরিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরবি-ফারসি শব্দের মোহে ভুগিতেছেন আর কবিগুরুর সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ও আজিকার কি কালিকার ঘটনা মাত্র নহে। নজরুল অবাক মানিতেছেন: 'কই, এতদিন ত কোনো কথা উঠল না এ নিয়ে!' (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৮)!

বাংলায় আরবি ও ফারসি শব্দ এস্তেমাল করার পক্ষে দুইপ্রস্ত যুক্তি হাজির করিয়াছিলেন নজরুল ইসলাম। এক যুক্তি সামান্য, আরটা বিশেষ। সামান্য যুক্তিটি দেখাইতে বসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি মনে করি, বিশ্ব-কাব্য-লক্ষ্মীর একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে ব'লেও আমার জানা নেই' (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৭)। নজরুলের দাবি, যে 'খুনে'র জন্য কবিগুরু রাগ করিয়াছেন তাহা তো বাংলায় নিত্য-ব্যবহৃত শব্দের তালিকায়। তাহা তো সামান্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'হৃদয়েরও খুন-খারাবী হ'তে দেখি আজো। এবং তা শুধু মুসলমান পাড়া লেনেই হয় না' (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৭)। তাঁহার যুক্তি:

> আমি যেখানে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ঐ রকম ন্যাশন্যাল সঙ্গীতে বা রুদ্ররসের কবিতায়। যেখানে 'রক্তধারা' লিখবার, সেখানে জোর ক'রে 'খুনধারা' লিখি নাই। তাই ব'লে 'রক্ত-খারাবী'ও লিখি নাই, হয় 'রক্তারক্তি' না হয় 'খুন-খারাবী' লিখেছি (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৭-২৮)।

নজরুল ইসলামের কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন প্রমথ চৌধুরী। পার্থক্যের মধ্যে একটু ঘুরাইয়া বলিলেন বটে: '"কথায় কথায় রক্তকে খুন বলাটা" যে সাহিত্যিক অপরাধ, তার কারণ, কথায় কথায় খুনকে রক্ত বলাটাও সমান অপরাধ।' ইহার কারণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন চৌধুরী: 'কথায় বলে, "যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি।" কথা সত্য, কিন্তু তাই ব'লে বঙ্গ-সাহিত্যে মুড়ি ও চাল-ভাজার অদ্বৈতবাদ অচল। ন্যায়সঙ্গত খুন ও রক্তেরও অদ্বৈতবাদ অচল' (চৌধুরী ১৯৬৭: ৬৬০)।

এক কথায়—প্রমথ চৌধুরী সত্যই বলিয়াছেন—'অভিধানে খুন আর রক্ত এক হতে পারে, কিন্তু ব্যাকরণে তা নয়।' তাঁহার বিচারে, 'আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যাকে "পদ" বলি, তার দুকুল আছে, এক অভিধান-কুল আর এক ব্যাকরণ-কুল। শব্দের এই দুকুল রক্ষা ক'রে ব্যবহার করাই সাহিত্যের ধর্ম' (চৌধুরী ১৯৬৭: ৬৬০)।

সর্বশেষ টিপ্পনীটি অধিকতর চিত্তাকর্ষক। চৌধুরী সাহেবের মতে 'খুন' শব্দের আরো এক গুণ: 'বাংলা ভাষায় খুনের যত মিল খুঁজে পাওয়া যায়, রক্তের তার শতাংশের একাংশও পাওয়া যায় না।' রসিকতার চূড়ান্ত হইয়াছে এই বাক্যে: 'এমন কি বর্ণমালার শেষ অক্ষরজাত হুনের সঙ্গে খুনের সম্বন্ধ অতি নিকট' (চৌধুরী ১৯৬৭: ৬৬০)।

কবিতা লিখিতে মিলের প্রয়োজন—অন্তত পুরাতন বাংলা ভাষায়। অথচ—প্রমথ চৌধুরী খুনসুটি করিয়া, বলিলেন—রবীন্দ্রনাথ খুনের এই জবর গুণটি লক্ষ্যই করেন নাই! এই আবিষ্কারের আগে তিনিই কিনা বলিতেছিলেন বাংলা সাহিত্য হইতে আরবি ও ফারসি শব্দ বহিষ্কার করিতে আর যেই বা উৎসুক হইতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পারেন না। কেননা বাংলা ভাষা কি পদার্থ তিনি তাহা জানেন।

বাংলা জানা কোন লোক বাংলা হইতে আরবি ও ফারসি তাড়াইতে উৎসুক হইবেন না। চৌধুরী বলিতেছেন: 'আরবী-ফার্সি শব্দ যদি ত্যাগ করতে হয়, তা'হলে আমাদের সর্বাগ্রে "কলম" ছাড়তে হয়। কারণ ও-শব্দটি শুধু আরবী নয়, এমন অনির্বচনীয় আরবী যে ও-শব্দ হাঁ ক'রে কণ্ঠমূল থেকে উদ্‌গিরণ করতে হয়। ও "ক" হিন্দু জবানে বেরয় না এক কাশি ছাড়া' (চৌধুরী ১৯৬৭: ৬৫৯)।

'বীরবল' পোশাকধারী প্রমথ চৌধুরীর কথাই সত্য বটে। পার্থক্যের মধ্যে, তিনি মনে করেন তিনি সমাজে শুদ্ধ 'আমি' বলিতে পারেন, 'আমরা' বলিবার অধিকার তাঁহার জন্মায় নাই। দুঃখের কথা, 'বীরবলী ভাষা'ও বাংলা সাহিত্যে একঘরে বটে। প্রমথ চৌধুরীর কথা যে সত্য তাহার আকাট প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই দিয়াছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, রবীন্দ্র-নজরুল বিবাদটা কি সত্যই মিটিয়া গিয়াছিল? অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পথ ধরিয়া একাধিক নজরুল জীবনচরিতকার বলিয়াছেন, প্রমথ চৌধুরীর মধ্যস্থতায় রক্ত আর খুনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাদটা মিটিয়া গিয়াছিল। উদাহরণস্থলে রফিকুল ইসলাম লিখিয়াছেন: '... প্রমথ চৌধুরীর এই প্রবন্ধের ফলে ভুল বোঝাবুঝির অনেকটা অবসান ঘটে এবং নজরুল প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। ফলে তাঁদের পূর্বেকার স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়' (ইসলাম ১৯৭২: ৪৬২)।

রবীন্দ্রনাথের সহিত নজরুল ইসলামের বিরোধ যদি মিটিয়াছিল তো ভালই হইয়াছিল। সমস্যার মধ্যে, আমরা দেখিতেছি জীবনের শেষ বছরেও ঠাকুর আসল কথার হেরফের করেন নাই; আপনার প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত ছিলেন অটুট। বৈশাখ ১৩৪১ 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'মস্তব-মাদ্রাসার বাংলা' শিরোনামে একপ্রস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লেখাটি পরে 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে 'ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা' নামে। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:

> বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসী আরবী শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু যে-সব পারসী আরবী শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা হয়তো কোনো-এক শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলে নি, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল (ঠাকুর ১৩৯১: ৩০৫-৬)।

এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ যাঁহার উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলেন তাঁহার নাম এম এ আজান। এখন 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' বইতে 'ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা' নামাঙ্কিত প্রবন্ধে সংকলিত তিন পত্রের মধ্যে এই পত্রই প্রথম। প্রবন্ধে তৃতীয় পত্রের রচনাকাল দেওয়া আছে '৬/৯/৪০' (ঠাকুর ১৩৯১: ৩০৮)। ধরিয়া লইতেছি তারিখটি ইংরেজি মতে। মানে পত্রটি ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ নাগাদ লেখা। ইহার পর ঠাকুর আবারো আপন যুক্তি সজেদে জাহির করিলেন আবুল ফজল বরাবর লিখিত অপর পত্রে:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুনখারাবি শব্দটা ভাষা সহজেই মেনে নিয়েছে, আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে ভাষা স্বীকার করে নি, কোনো বিশেষ পরিবারে বা সম্প্রদায়ে ওই অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে তবু সাধারণ বাংলা ভাষায় ওই অর্থ চালাতে গেলে ভাষা বিমুখ হবে (ঠাকুর ১৩৯১: ৩০৮)।

১৯২৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর নাগাদ প্রকাশিত 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' নিবন্ধে নজরুল ইসলাম ঘোষণা করিয়াছিলেন, '"খুন" আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানী বা বলশেভিকী রং দেওয়ার জন্য নয়।' তিনি বিজ্ঞাপিত করিলেন, 'আমি শুধু "খুন" নয়—বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে' (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৭)।

তাঁহার জবাবদিহির প্রথম দফা আমরা আগেই দেখিয়াছি। এই দফার সারকথা আরো একবার বলা যায়। শুদ্ধ সুন্দরের খাতিরেই নজরুল ইসলাম আরবি ও ফারসি শব্দ এস্তেমাল করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় জবাবটি আরো লাগসই। এই জবাবের যুক্তি উত্তরাধিকারের, সামাজিকতার। তিনি বলিতেছেন:

AMARBOI.COM

কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভু'লে যান যে, বাংলার কাব্য-লক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তা'রা তাঁদের কাছ থেকে টুপী আর চাপকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গীর সুর শুনতে, ফুল-বনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৮)।

নজরুল আরো বলিলেন, 'এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেল যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্য-সভায় ভিড় না ক'রে হিন্দু-সভারই মেম্বার হ'ন গিয়ে।' লিখিলেন: 'যে কবিগুরু অভিধান ছাড়া নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি ক'রে ভাবীকালের জন্য আরো তিনটে অভিধানের সঞ্চয় রেখে গেলেন, তাঁর এই নতুন-শব্দ-ভীতি দেখে বিস্মিত হই' (ইসলাম ১৯৬৭খ: ৬২৮)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সামাজিকতা'কে 'সাম্প্রদায়িকতা' বলিয়া তুচ্ছ করা আর সমাজের অস্তিত্ব অস্বীকার করা একান্তই সমার্থক। এই ভয়ংকর সাম্প্রদায়িকতা যে অন্যান্যের মধ্যে বাংলার দ্বিতীয় বিভাজনের প্রথম কারণ সে সত্যে সন্দেহ কি!

৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নতুন-শব্দ-ভীতি'র অপর নামই 'সাম্প্রদায়িকতা'। শুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ কেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বাংলায় 'অত্যধিক' আরবি, ফারসি, বা উর্দু কথা ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। জুলাই ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নিবন্ধেও তাহার পরিচয় আছে।

> বাংলা-সাহিত্যকে বিকৃত করবার একটি হীন প্রচেষ্টা চলছে। কেউ বলছেন, সংখ্যার অনুপাতে ভাষার মধ্যে এতগুলি 'আরবী' কথা ব্যবহার কর; কেউ বলছেন, এতগুলি 'পারসী' কথা ব্যবহার কর; আবার কেউ বা বলছেন, এতগুলি 'উর্দু' কথা ব্যবহার কর। এটা একেবারে অকারণ,—যেমন ছোট ছেলে হাতে ছুরি পেলে বাড়ির সমস্ত জিনিস কেটে বেড়ায়, এ-ও সেইরূপ (চট্টোপাধ্যায় ২০১৮: ৮৯৪)।

উন্মাদনার হাত হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যে রক্ষা পান নাই তাহার প্রমাণ আছে ১৯৩০ সালের পরে লেখা তাঁহার একাধিক পত্রে ও প্রবন্ধে। ভাদ্র ১৩৩৯ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে এখনো অধোবদন হইতে হয়। বাংলায় 'রক্ত' অর্থে 'খুন' চলিবে না বলিয়া যে বাজি ঠাকুর ধরিয়াছিলেন তাহাতে কেহই জেতেন নাই। হারিয়াছে বাংলা। তাড়া খাইয়াছে বাংলাদেশ।

বাংলায় রক্ত অর্থেও খুন চলিতে পারে। নহিলে 'ও দুনিয়ার মজদুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইসব, আয় এক মিছিলে দাঁড়া'—এই গানের অন্তর্গত 'খুন রাঙা লাল ঝাণ্ডা শক্ত হাতে ধর' কথাটি বাংলায় কিভাবে চলিয়া গেল?

ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'ভাষা মাত্রের মধ্যে একটা প্রাণধর্ম আছে। তার সেই প্রাণের নিয়ম রক্ষা করে তবেই লেখকেরা তাকে নূতন নূতন পথে চালিত করতে পারে' (ঠাকুর ১৩৯১: ৩০১)। প্রাণের নিয়ম কথাটা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তিনি একটা ভয়ানক উদাহরণ দিলেন। একালের বিচারকেরা বলিবেন, এই উদাহরণ নিতান্তই জাতিবিদ্বেষপুষ্ট বা 'বর্ণবাদী'। বিশ্লেষণশাস্ত্রের ছাত্রীরা হয়ত বলিবেন অজ্ঞান জিনিশটার একটা গড়ন আছে আর সে গড়ন ভাষার মতন। রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞান এই উদাহরণে পরিষ্কার প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন:

> মনে করা যাক, বাংলা দেশটা মগের মুল্লুক এবং মগ রাজারা বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের নাক-চোখের চেহারা কোনোমতে সহ্য করতে পারছে না, মনে করছে ওটাতে তাদের অমর্যাদা, তা হলে তাদের বাদশাহী বুদ্ধির কাছে একটিমাত্র অপেক্ষাকৃত সম্ভবপর পন্থা থাকতে পারে সে হচ্ছে মগ ছাড়া আর-সব জাতকে একেবারে লোপ করে দেওয়া। নতুবা বাঙালিকে বাঙালি রেখে তার নাক মুখ চোখে ছুঁচ সুতো ও শিরীষ আঠার যোগে মগের চেহারা আরোপ করবার চেষ্টা ঘোরতর দুর্দাম মগের বিচারেও সম্ভবপর বলে ঠেকতে পারে না (ঠাকুর ১৩৯১: ৩০১)।

ঠাকুর 'শিশুপাঠ্য বাংলা কেতাবে গায়ের জোরে আরবীআনা পারসীআনা' করাকে বাংলা ভাষার উপর 'মগের চেহারা' আরোপ করিবার মতনই অসম্ভব ব্যবসায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। ঠাকুরের এই 'আরবীআনা' আর 'পারসীআনা' বানান দুইটি সাক্ষ্য দেয় তিনি বাংলা লেখার বিধান গ্রাহ্য করেন নাই। বাংলার বিধান অনুসারে শব্দ দুইটি 'আরবীয়ানা' ও 'পারসীয়ানা' হইবার কথা। আধুনিক রীতিতে দাঁড়াইত বড়জোর 'আরবিয়ানা' ও 'পারসিয়ানা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের না জানার কথা নহে, বাংলায় 'অ' ধ্বনি শব্দের অন্দরে কিংবা অন্তে বসিলে 'য়' রূপ ধারণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ থাকে যে বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বিদ্যাসাগর কর্তৃক সংস্কৃত 'য' বর্ণের দ্বিতীয় সংস্করণ স্বরূপে 'য়' বর্ণ প্রবর্তিত হইয়াছিল।

'আচারনিষ্ঠ মুসলমান'কে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, বাংলা কেতাবকে যদি মাঝে মাঝে আরবি বা ফারসি ছিটাইয়া শোধন করিতে হয় তো ইংরেজি স্কুলপাঠ্যের ভাষাকেও শোধন করিতে হইবে না কেন? এরূপ কাল্পনিক শোধনের একপ্রস্ত নমুনা কবি নিজেই দেখাইলেন।

ইংলন্ডের কবি জন কিটসের এক কবিতার নাম 'হাইপেরিয়ন'। গ্রিক জবানে 'উপেরিয়ন'। বিষয় গ্রিক পুরাণ হইতে আহরিত। কবিতাটির পহিলা চারি পংক্তি ঠাকুর এলোমেলো কিছু ফারসি শব্দ ছিটাইয়া সংশোধন করিলেন। লক্ষ্য কবিতাটির কিরকম 'শ্রীবৃদ্ধি' হয় তাহা খুঁটাইয়া দেখা। জন কিটসের আদি লেখা ও রবীন্দ্রনাথের সংশোধিত রূপটি পরপর পড়িয়া দেখিলে বোঝা যায় এহেন সংশোধনে ভাষার কি শ্রীহানি ঘটে। ঠাকুর যদি এই সংশোধনকার্যে সময় ব্যয় না করিয়া নিজ পিতৃদেবের 'আত্মজীবনী' পড়িয়া দেখিতেন তো অনেক আপদের হাত হইতে রক্ষা পাইতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'আত্মজীবনী'র পাতায় পাতায় গণ্ডায় গণ্ডায় হাফিজের বয়েত উদ্ধার করিয়া বাংলা গদ্যের প্রসার ঘটাইয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য, ঠাকুর ১৯৬২)। রবীন্দ্রনাথ যদি কিছু ফারসি শিক্ষা করিবার সুযোগ না পাইয়া থাকেন, তাহার দায় কে বহন করিবে!

Deep in the shady sadness of a vale
Far sunken from the healthy breath of morn,
Far from the fiery noon, and eve's one star,
Sat gray-hair'd Saturn, quiet as a stone,
Still as the silence round about his lair;
(Keats 1984: 221)

জন কিটস প্রণীত এই পংক্তিনিচয়ের 'মুসলমানীকরণ' করিলেন কবিরাজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহাতে অবজ্ঞা আর বিদ্রূপের যুগলবন্দিটা দুর্নিরীক্ষ্য নহে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Deep in the *Saya-i-ghamagin* of a vale,
Far sunken from the *nafas-i-hayat afza-i*-morn,
Far from the *atshin* noon and eve's one star,
Sat *bamoo-i-safid* Saturn *Khamush* as a *Sang*.
(ঠাকুর ১৩৯১: ৩০২; বাঁকা হরফ মূলের)

নমুনাটি সামনে রাখিয়া কবি উপদেশ বিতরণ করিলেন, 'মৌলবী ছাহাব' যেন এরকম ব্যঙ্গীকরণ না করেন। ঠাকুরামৃত তথৈবচ: 'জানি কোনো মৌলবী ছাহাব প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ইংরেজি সাহিত্যিক ভাষার এ রকম মুসলমানীকরণের চেষ্টা করবেন না।' তিনি যোগ করিলেন: 'এমন অবস্থায় কীট্‌সের হাইপীরিয়নকে বরঞ্চ আগাগোড়াই ফারসীতে তর্জমা করিয়ে পড়ানো ভালো তবু তার ইংরেজিটিকে নিজের সমাজের খাতিরেও দো-আঁশলা করাটা কোনো কারণেই ভালো নয়। সেই একই কারণে ছাত্রদের নিজের খাতিরেই বাংলাটাকে খাঁটি বাংলারূপে বজায় রেখেই তাদের শেখানো দরকার' (ঠাকুর ১৩৯১: ৩০৩)।

রবীন্দ্রনাথ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ইংরেজি ভাষায় ততদিনে এরকম শত শত 'ফরাশি' (ফারসি নহে) শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। তাহা মোটেও ইংরেজিকে ব্যঙ্গ করে না। কারণ সে দেশে কয়েক দফায় কয়েক শত বৎসর ফরাশি শাসন বিরাজ করিয়াছিল। ঠিক একই কারণে বাংলা ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ফারসি ভাষার প্রবেশাধিকার।

ইতিহাস অনপনেয়। তাহা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর বড় একটা নির্ভর করে না। ঠাকুরের ইচ্ছাতেও না।

৯

যেকোন ভাষাই সে ভাষার খাঁটি রূপে শিখাইতে হয়—এ সত্যে বোধ করি কেহ দ্বিমত করিবেন না। প্রশ্ন থাকিবে, খাঁটি বাংলা কি বস্তু? আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলার স্বভাব অথবা প্রকৃতিই বা কি পদার্থ? এই প্রশ্নের সম্যক বিচার না করিলে ভাষার বিধান মানার দাবিটা অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন, 'ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে একটা বিধান আছে যার দ্বারা নূতন শব্দের যাচাই হতে থাকে, গায়ের জোরে এই বিধান না মানলে জারজ শব্দ কিছুতেই জাতে ওঠে না' (ঠাকুর ১৩৯১: ৩০৭-৮)।

দুর্ভাগ্যের মধ্যে, সেই বিধান কি পদার্থ তাহা তিনি নিজে জানেন না; অন্য কাহাকেও জানিতে দিবেন না। 'খুন' বাংলায় ফারসি হইতে আমদানি করা মাল—এই সত্যে সন্দেহ নাই। ইহার প্রচলিত অর্থ 'হত্যা'—এ কথাও মিথ্যা নহে। তবে শব্দটির আদ্য অর্থের সন্ধান যাঁহারা রাখেন তাঁহারা জানেন, খুন শব্দের আক্ষরিক, আভিধানিক অর্থ 'রক্ত'। হিন্দুস্তানি (হিন্দি বা উর্দু) ভাষায় সেই আদ্যার্থই আজও বহাল (মিত্র ২০০৭: ২৮৩)।

খুন অর্থ আদিতে ছিল 'রক্ত'। বাংলা ভাষায় তাহা 'হত্যা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে ভাষার নিয়মেই। এই নিয়মের আপন নাম লক্ষণা বা মেটোনিমি। লক্ষণার শুরু নৈকট্য বা কনটিগুইটি হইতে। যে কাজ করিলে খুন বা রক্ত বাহির হইয়া যায় তাহাকে 'খুন' বলাই যায়। তাই 'খুন' বিশেষ্য বাংলায় 'খুন' ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে। দেহ হইতে খুন বাহির হইলে পরিণতি কি ঘটিবে তাহা তো খুন না করিয়াও বলা যায়। বিশেষ্য খুনের অতিরিক্ত নিঃসরণের পরিণতিতে ক্রিয়া খুনের আবির্ভাব হয়, মানুষের মৃত্যু বা হত্যাকাণ্ড ঘটে। এই দ্বিতীয় নিয়মের নাম রূপক বা মেটাফর।

রূপকের সূচনা সাদৃশ্য বা সিমিলারিটি হইতে। কিন্তু সাদৃশ্যই শেষ কথা নহে। রূপকই শেষবিচারে ভাষার আদল। এইভাবে দুই অলংকার—প্রথমে নৈকট্যসূত্রে লক্ষণা ও পরে সাদৃশ্যহেতু রূপক—মিলিয়া বাংলায় খুন শব্দের অর্থ বাড়িয়া উঠিয়াছে। 'রক্ত' অর্থের খুন আর 'হত্যা' অর্থের খুন দুইটাই বেমালুম মালুম হইয়াছে। মজার জিনিশ, ঠাকুর ছোট্ট শিশুর মতন আবদার ধরিয়াছিলেন, তিনি রূপকটা (হত্যা অর্থে খুন) গ্রহণ করিবেন, লক্ষণা (রক্ত অর্থে খুন) মানিবেন না।

ভাবিতে লজ্জা করে, না শরম লাগে? এই বিষয়ে আর অধিক লিখিব না। ভাষার এই বিধান তিনি জানিতেন না ভাবিতে আমার লজ্জা আর শরম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুইটাই লাগিতেছে। কেননা আমি না তরুণ, না সাহিত্যিক। অকরুণ কিনা বলিতে পারি না। প্রমথবাবু বলিয়া রাখিয়াছেন, 'আর রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা ভাষা জানেন না এমন কথা বোধ হয় কোনও অকরুণ তরুণ সাহিত্যিকও বলতে চান না' (চৌধুরী ১৯৬৭: ৬৫৯)।

মাত্র আটাশ বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম সম্ভবত ভাষার বিধানের কিয়দংশ ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি একই কবিতায় 'রক্ত' আর 'খুন' যুগপদ এস্তেমাল করিতে কসুর করেন নাই। ইহাই তাঁহার অপরাধ।

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দু'টো ভাত একটু নুন।
বেলা ব'য়ে যায়, খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন!
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে না'ক তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর **খুন**?

* * *

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ **রক্ত-লেখা**,
বড় কথা বড় ভাব আসে না'ক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!
(ইসলাম ১৯৬৭ক: ৪৪; মোটা হরফ সংযুক্ত)

প্রমথ চৌধুরীর কথাই বোধ করি ধর্তব্য: 'অভিধানে খুন আর রক্ত এক হতে পারে, কিন্তু ব্যাকরণে তা নয়। রক্তও বিশেষ্য, খুনও তাই। কিন্তু রক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরন্তু বিশেষণ, খুন তা নয়। অপরপক্ষে খুন ক্রিয়া, রক্ত তা নয়' (চৌধুরী ১৯৬৭: ৬৬০)।

সাম্প্রদায়িক হানাহানির দিনে (কিংবা রাতে) ভেদবুদ্ধির আঘাত কি পরিমাণ গুরুতর হইতে পারে রবীন্দ্রনাথের ধরা এই রক্তের বাজিতে তাহার অকরুণ প্রমাণ মিলিল। তাঁহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বাংলা ভাষা রক্ত অর্থেও 'খুন' শব্দ গ্রাহ্য মনে করিয়াছে। এতদিনে বলা যায়, নজরুল ইসলামের কবিতায় যে বিধানটি মূর্ত তাহাই ভাষার মূল প্রকৃতি, নিত্য স্বভাব। এই দুনিয়ার ভাষায় কোন 'চিরকেলে বাণী' নাই। 'অমর কাব্য' বলিয়াও কিছু নাই মর্তলোকে।

'অপার্থিব প্রতিভা' কিংবা 'পারত্রিক সৃজনশীলতা' প্রভৃতিও সমান পৌরাণিক কথা। সকলই 'যুগের হুজুগ'। সকলই প্রভাতের ভৈরবী। বিধান শুদ্ধ এই একটাই। এই বিধান অস্বীকারের চেষ্টাও হইয়াছে যুগে যুগে। মনে হইতেছে 'যুগের হুজুগে' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই চেষ্টায় শরিক হইয়াছিলেন।

ভাষায় নতুন শব্দ আসে কমসে কম দুই পথে। এক নম্বরে বাহির হইতে। এই পথটা আমদানির। দুই নম্বরে পথ কাটে ভিতরে ভিতরে। রূপান্তর ও নামান্তর—রূপক ও লক্ষণা—আকারে। এই দুই নম্বর পথটা অর্থ উৎপাদনের পথ। রবীন্দ্রনাথ এক নম্বর পথ মানিয়া লইলেও দুই নম্বরটা কবুল করিতে রাজি হইলেন না।

ঠাকুর বাহিরে বাহিরে কবুল করিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা 'বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আপন' ভাষা; 'তার স্বাভাবিক প্রমাণ ভাষার মধ্যে প্রচুর' রহিয়াছে। লিখিয়াছিলেন: 'এমন কোনো সভ্য ভাষা নেই যে নানা জাতির সঙ্গে নানা ব্যবহারের ফলে বিদেশী শব্দ কিছু-না-কিছু আত্মসাৎ করে নি। বহুকাল মুসলমানের সংস্রবে থাকাতে বাংলা ভাষাও অনেক পারসী শব্দ এবং কিছু কিছু আরবীও স্বভাবতই গ্রহণ করেছে।' আরেক কিস্তি ঠাকুরামৃত:

> যত বড়ো নিষ্ঠাবান হিন্দুই হোক-না কেন ঘোরতর রাগারাগির দিনেও প্রতিদিনের ব্যবহারে রাশি রাশি তৎসম ও তদ্ভব মুসলমানী শব্দ উচ্চারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে তাদের কোনো সংকোচ বোধ হয় না। এমন-কি, সে-সকল শব্দের জায়গায় যদি সংস্কৃত প্রতিশব্দ চালানো যায় তা হলে পণ্ডিতী করা হচ্ছে বলে লোকে হাসবে। বাজারে এসে সহস্র টাকার নোট ভাঙানোর চেয়ে হাজার টাকার নোট ভাঙানো সহজ। সমনজারি শব্দের অর্ধেক অংশ ইংরেজি, অর্ধেক পারসী, এর জায়গায় 'আহ্বান প্রচার' শব্দ সাধু সাহিত্যেও ব্যবহার করবার মতো সাহস কোনো বিদ্যাভূষণেরও হবে না। কেননা, নেহাত বেয়াড়া স্বভাবের না হলে মানুষ মার খেতে তত ভয় করে না যেমন ভয় করে লোক হাসাতে (ঠাকুর ১৩৯১: ৩০১-২)।

নতুন শব্দ আমদানির দ্বিতীয় একটা এজাজতও ঠাকুর মহাশয় দিয়াছিলেন। তবে পুরাতন শব্দ যে নতুন অর্থ উৎপাদন করিতে পারে তাহা তিনি মানিলেন না। তিনি নতুন শব্দের এলাকা দাগাইয়া দিয়া বলিলেন, শুদ্ধ মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনায় তাহা চলিবে। এক্ষণে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনায় নতুন শব্দ চলিবে কথাটার মানে অন্যত্র তাহা চলিবে না। এই বক্তব্য সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের পরিষ্কার উদাহরণ।

AMARBOI.COM

শক্তিমান মুসলমান লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেন নি, এ অভাব সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব। এই জীবনযাত্রার যথোচিত পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই পরিচয় দেবার উপলক্ষে মুসলমান সমাজের নিত্যব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতই প্রবেশলাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না, বরং বলবৃদ্ধি হবে, বাংলা ভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে... (ঠাকুর ১৩৯১: ৩০৮)।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে।' তিনি ঠিকই ধরিয়াছিলেন, রূপক অর্থে খুন ভাষার রাজপথে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু লক্ষণার গুণে খুন কথাটা যে রক্ত অর্থেও চলে তাহা তিনি কোনদিন আমল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিতে পারেন নাই। তাই লিখিয়াছেন: 'কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলে নি, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল' (ঠাকুর ১৩৯১: ৩০৫-৬)।

আগে নাই বা চলিল। এখন চালাইতে অসুবিধা কোথায়? রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, চালাইলে ভাষা বিমুখ হইবে। জীবনের শেষ বছরেও এই গোঁ ছাড়িলেন না তিনি। আমরা আগেও এই বক্তব্য উদ্ধার করিয়াছি। এই জায়গায় তাহার পুনরাবৃত্তি আশা করি পাঠকের মার্জনা পাইবে:

> খুনখারাবি শব্দটা ভাষা সহজেই মেনে নিয়েছে, আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে ভাষা স্বীকার করে নি, কোনো বিশেষ পরিবারে বা সম্প্রদায়ে ওই অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে তবু সাধারণ বাংলা ভাষায় ওই অর্থ চালাতে গেলে ভাষা বিমুখ হবে (ঠাকুর ১৩৯১: ৩০৮)।

AMARBOI.COM

আগেই দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই রক্ত ব্যবসায় বাংলা ভাষা সহজে মানিয়া লয় নাই। কেননা ঠাকুরের এই ন্যায় ন্যায় নয়—অন্যায়, মাৎস্যন্যায়। এক মাৎস্যন্যায়ের পরিণতি আরো মাৎস্যন্যায়। তাঁহার শিষ্যশাবকের কল্যাণে আমরা জানিয়াছি, বাংলায় আমদানিকৃত আরবি-ফারসি শব্দের সংখ্যা সাকুল্যে আড়াই কি তিন হাজার। ঠাকুরের অনুমোদনধন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মতের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। তদীয় শুমারি অনুসারে বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ব্যবহার্য আরবি-ফারসি শব্দের সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি, যাহার মধ্যে শতকরা মাত্র চার ভাগ 'ফারসী কিংবা ফারসীর মাধ্যমে আরবী ও তুর্কী প্রভৃতি বিদেশী শব্দ' (দ্রষ্টব্য, হাই ১৯৬৭: [পাঁচ]-[ছয়])।

১৯৭১ সালে সুনীতিকুমারের শিষ্য সুকুমার সেন সময়সীমার হিশাব আনুমানিক ১০০০ হইতে ১৮০০ সাল পর্যন্ত কষিয়া বাংলা শব্দের একটি বুৎপত্তি অভিধান লিখিয়াছিলেন। তাহাতে আরবি-ফারসি ও তুর্কি হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমদানি করা শব্দ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন আরো কম—সাকুল্যে ১,৬৯৬টি মাত্র (সেন ১৯৭১: vi)। উদাহরণস্থলে বলিতে হয়, 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় প্রাপ্ত কোন আরবি-ফারসি শব্দ আমলে নেন নাই তিনি।

ইহার সহিত ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হরেন্দ্র চন্দ্র পালের 'বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ' অভিধানের তুলনা করা যাইতে পারে। পাল মহাশয় আদি আধুনিক (অর্থাৎ ১৭৫৭ সালের আগের) ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানাবিধ উৎস হইতে হাজার তিনেক আরবি-ফারসি শব্দ বা শব্দবন্ধের তালিকা উদাহরণসহ সংকলন করিয়াছিলেন। তিনি 'ময়মনসিংহ গীতিকা' কি 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'কে অচ্ছুত বিবেচনা করেন নাই।

তুলনায় পূর্ব বাংলার কর্মযোগী গবেষকদের হিশাবে এইসব সংখ্যা খানিক অধিক দেখা যায়। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের একান্ত ধারণা, পূর্ব বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের মুখের ভাষায় এইসব শব্দের শতকরা হার চার নয়, আনুমানিক সাতটি। তাঁহার দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ১৯৬৭ নাগাদ প্রকাশিত গোলাম আকসুদ হিলালীর 'বাংলায় আরবি-ফারসি উপাদান' নামক অভিধানে অন্তর্ভুক্ত আরবি-ফারসি শব্দের সংখ্যা পাঁচ হাজারের কিছু বেশি। সঠিক বলিতে সংখ্যাটি ৫,১৮৬ (দ্রষ্টব্য, হাই ১৯৬৭: [ছয়])।

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল লক্ষ্য করিয়াছেন, '... ঊনবিংশ ও তৎপূর্ব শতাব্দীতে আরবী-ফারসীর ব্যবহার যত বাঙলা সাহিত্যে দৃষ্ট হয়, ততটা পরবর্তী যুগে হয় নি।' তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, '... মধ্যযুগে মুসলিম কৃষ্টির প্রভাব বাঙলার গভীরে যতটা বিস্তৃত হয়েছিল, পরবর্তী যুগে তা তেমন অক্ষুণ্ন থাকে নি' (পাল ১৯৬৭: [বার])। তাহা সত্ত্বেও বিশ শতকের উর্বর সাহিত্যিকগণ—যথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী—'প্রাকৃত আরবী-ফারসী শব্দকে' সম্পূর্ণ 'অমান্য' করিতে পারেন নাই। সে কথা হরেন্দ্র চন্দ্র পাল যথার্থই স্মরণ করিয়াছেন:

> ... আশ্চর্য এই যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এমন সব আরবী-ফারসী শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহার তাঁর সাহিত্যে করেছেন, যা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। তবে এটাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক যে শিক্ষিতের চেয়ে অশিক্ষিত জনসাধারণের মুখেই আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার বহুল দৃষ্ট হয়। তার উজ্জ্বল প্রমাণ পাই 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় (পাল ১৯৬৭: [বার])।

এদিকে অনেকে এই সকল গীতিকা 'জাল' বলিয়া 'এষ্টিপন্' করিলেন (দ্রষ্টব্য, সেন ১৯৬৭: চিঠিপত্র—১৫-১৬)। সুকুমার সেনের মতে, এগুলি অর্বাচীন অর্থাৎ ইংরেজি ১৮০০ সালের পরের রচনা। তিনি আরো ধরিয়া লইয়াছিলেন, এগুলি ইতর সাধারণের ভাষা মাত্র, 'সর্বজনের' নহে। নজরুল ইসলাম অকারণে বুক চাপড়ান নাই: 'ও বাবা! সাহিত্যের আসর যে পলিটিক্যাল আখড়ার চেয়েও নোংরা, তা কে জানত!'

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের শেষ শতক ব্যাপিয়া যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়াছিল তাহাদের বেশির ভাগের আশু কারণ পাওয়া যায় গোহত্যা নিবারণ বা গোরক্ষা আন্দোলনে। প্রায় হাজার বছরের মুসলমান শাসনের যুগে তো বটেই, এমনকি ইংরেজ শাসনের প্রথম শতকেও গোহত্যা নিবারণের দাবিতে বড় একটা দাঙ্গা বাধে নাই। এই ধরনের বড় দাঙ্গার প্রথম আয়োজন হয় ১৮৭০ সালের পর—বোম্বে সাক্ষিণাত্যে আর যুক্ত প্রদেশে।

বড় বড় দাঙ্গার আরেক উপলক্ষ ছিল মসজিদের আশেপাশে ঢাকঢোল পিটাইয়া গানবাজনার উস্কানি। ১৯৫০ সাল নাগাদ জনৈক ইহুদি বংশোদ্ভূত মার্কিন ধুরন্ধর মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান হাজার বছর ধরিয়া পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছেন, সেই হাজার বছরের সবটুকু জুড়িয়াই উস্কানির এইসব কারণ বিরাজ করিতেছিল। তবে এক শতকের শেষ তিন সিকিভাগে মাত্র এইগুলি ভীষণ উদ্বেগ আর বিবাদ-বিসংবাদের কেন্দ্রস্থল হইয়া ওঠে' (থর্নার ১৯৮০: ১০৪)।

দুঃখের মধ্যে, ব্রিটিশ শাসনের শেষ পঁচাত্তর বছরে গোহত্যা নিবারণ আর মসজিদের আশেপাশে গানবাজনা নামক সমস্যা পার হইয়া তৃতীয় এক সমস্যাও মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। এই নিবন্ধে আমরা তাহার একটি উদাহরণ মাত্র আলোচনা করিলাম। ইহার নাম সহি বড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে ধার করিয়া হয়ত রাখা যায় 'ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃখের মধ্যে, আজ প্রায় একশ বছরের মাথায়ও সমস্যার সম্পূর্ণ রাহা হয় নাই। এখনো দেখি:

> দেবদারুর নিচে
> দেবদারু,
> ছোট ছোট দেবদারু বড় বড় দেবদারুর কথা শুনিতেছে
> (সারিকস্কি ২০২১: ২০)।

জুন ২০১১—জানুয়ারি ২০২৩

দোহাই

AMARBOI.COM

১ আবদুল আজীজ আল-আমান, *নজরুল-পরিক্রমা* (কলিকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৩৭৬)।

২ কাজী নজরুল ইসলাম, 'আমার কৈফিয়ৎ,' *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭ক), পৃ. ৪১-৪৪।

৩ _____ 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ,' *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭খ), পৃ. ৬২২-৩০।

৪ রফিকুল ইসলাম, *নজরুল জীবনী* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২)।

৫ কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ*, ২য় সংস্করণ (ঢাকা: ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩)।

৬ আবদুল কাদির, 'গ্রন্থ-পরিচয়,' কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭), পৃ. ৬৪১-৬০।

৭ সুমিতা চক্রবর্তী, 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা: অন্তিম রায়,' *সৃষ্টি-*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাতন্ত্র্যে নজরুল (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৭), পৃ. ১৬১-৬৮।

৮ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮)।

৯ প্রমথ চৌধুরী, 'বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা,' কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭), পৃ. ৬৫৮-৬০।

১০ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী,' সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, ৪র্থ সংস্করণ (কলিকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬২)।

১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলা শব্দতত্ত্ব*, পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সংকলিত, ৩য় স্বতন্ত্র সংস্করণ (কলিকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯১)।

১২ _____ *সাহিত্যের পথে*, ৪র্থ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১৪)।

১৩ _____ 'কবির অভিভাষণ,' *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১২শ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২২), পৃ. ৫০৭-১১।

১৪ হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯)।

১৫ অরুণকুমার বসু, *নজরুল-জীবনী* (কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০)।

১৬ বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক,' *প্রবন্ধ-সংকলন* (কলকাতা: ভারবি, ১৯৬৬), পৃ. ৭০-৮৪।

১৭ পেন্টি সারিকস্কি, *উহারা বাতাসে: কবিতা ১৯৫৮-১৯৮০*, সলিমুল্লাহ খান অনূদিত (ঢাকা: মধুপোক, ২০২১)।

১৮ দীনেশচন্দ্র সেন, '[দীনেশচন্দ্র] সেনের পত্র,' মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, *শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ* (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭), পৃ. চিঠিপত্র—১৩-১৬।

১৯ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *জ্যৈষ্ঠের ঝড়* (কলিকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন, ১৯৬৯)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০ মুহম্মদ আবদুল হাই, 'ভূমিকা,' হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭), পৃ. [পাঁচ]-[নয়]।

২১ Walter Benjamin, 'The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility [Second Version],' trans. Edmund Jephcott and Harry Zohn, in *Selected Writings*, vol. 3: 1935-1938, trans. Edmund Jephcott, Howard Eiland et al., eds. Howard Eiland and Michael W Jennings (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002), pp. 101-33.

২২ _____ 'The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility [Third Version],' trans. Harry Zohn and Edmund Jephcott, in *Selected Writings*, vol. 4: 1938-1940, trans. Edmund Jephcott et al., eds. Howard Eiland and Michael W Jennings (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006), pp. 251-83.

২৩ J C Ghosh, *Bengali Literature* (London: Oxford University Press, 1948).

২৪ John Keats, *Poetical Works*, ed. H W Garrod, reprint (Oxford: Oxford University Press, 1984).

২৫ Priti Kumar Mitra, *The Dissent of Nazrul Islam: Poetry and History* (New Delhi: Oxford University Press, 2007).

২৬ Sukumar Sen, *An Etymological Dictionary of Bengali: c. 1000-1800 A. D.* (Calcutta: Eastern Publishers, 1971).

২৭ Danial Thorner, *The Shaping of Modern India* (New Delhi: Allied Publishers, 1980).

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা

'খুনিয়ারা ইসলাম' বা খেলাফত আন্দোলনের প্রতিনিধি

কাজী আবদুল ওদুদ একদা—সেই ১৯৪২ সালে—'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন:

> বাংলা দেশে এক শ্রেণীর সাহিত্যরসিক আছেন যাঁরা নজরুল ইসলামকে জ্ঞান করেন একজন যুগ-প্রবর্তক কবি। আজকার দিনে তাঁদের সংখ্যা-শক্তি কেমন জানি না, তবে নজরুলের প্রতি তাঁদের কারো কারো অন্তরের গভীর অনুরাগের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। তাঁদের প্রতিপাদ্যের প্রধান অবলম্বন এই 'বিদ্রোহী'। তাঁদের ধারণা, এমন একটা ওজস্বিতা নজরুলের এই 'বিদ্রোহী' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে যা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন—বাংলার দার্শনিক আবহাওয়ায় এ চিন্তালেশহীন ভাস্বর-ললাট চির-তারুণ্য, এই দ্বিধাহীন দুর্মদ তারুণ্যই বাংলা সাহিত্যে নজরুল-প্রতিভার চিরগৌরবময় দান (ওদুদ ১৯৮৩: ৮২)।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই দাবি আবদুল ওদুদ নাকচও করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, 'যাঁদের এই মত, মনে হয় না নজরুলের এই তারুণ্য বাস্তবিকই তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেছেন।' তাঁহার ধারণা, নজরুল ইসলাম কোন নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগের সূচনা করেন নাই। কারণ—এক নম্বরে—'রবীন্দ্রনাথের "বলাকা"র যুগে নজরুল-প্রতিভার উন্মেষ।' ওদুদ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এখনো আমাদের হাসির না হইলেও কৌতূহলের উদ্রেক করে। তাঁহার আরো কিছু কথা উদ্ধার না করিয়া পারিতেছি না। ওদুদের স্মৃতিকথা অনুসারে:

আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে,
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদ্‌বে তারা কাঁদ্‌বে

অথবা

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে অবুঝ, ওরে সবুজ
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা

অথবা

শিকল দেবীর ঐ যে পূজা-বেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া,
পাগলামি তুই আয় রে দুয়ার ভেদি'।
ঝড়ের মাতন বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা বাছা
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা

ইত্যাদি ছত্র সে-যুগের বাংলার শিক্ষিত তরুণ-সমাজে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল—এক হিসাবে বাংলার তরুণ-আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়েছিল এই 'বলাকা' কাব্যের সাহায্যে (ওদুদ ১৯৮৩: ৮২-৮৩)।

সবিনয় নিবেদন করা চলে, নজরুল ইসলামের যুগে কবিতার সমস্যাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক কি দাঁড়াইয়াছিল তাহা কাজী আবদুল ওদুদ ধরিতেই পারেন নাই। তিনি প্রবাদপ্রতিম দন কিহোতের মতন অতীত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন মাত্র। 'বলাকা' আর 'বিদ্রোহী'—কম করিয়া বলিলেও বলিতে হইবে—ঠিক এক পদার্থ ছিল না।

আবদুল ওদুদের দ্বিতীয় যুক্তিটি ছিল আরো আগ্রাসী। তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন, নজরুল ইসলাম যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার 'সাহিত্যিক মর্যাদা' ধর্তব্যের মধ্যেই পড়িবে না। এই দ্বিতীয় বিচারের প্রতিধ্বনি আমরা পরকালের আরো অনেক লেখকের মধ্যে পাইব। বুদ্ধদেব বসুকে এই শোরগোলের মধ্যেও খানিক আলাদা করিয়া চেনা যায়। ওদুদের একপ্রস্ত প্রস্তাবের পুনরুক্তি করিতেও বুদ্ধদেব একদা কসুর করেন নাই। ওদুদ লিখিয়াছিলেন;

> দ্বিতীয়ত, নজরুলের লেখনীতে যে-বৈচিত্র্য রূপ পেয়েছে তার সাহিত্যিক মর্যাদা কেমন সেটিও একটি বড়ো অনুধাবনের বিষয়। একটু মনোযোগী হলেই চোখে পড়ে, নজরুলের রচনা, বিশেষ করে তাঁর 'বিদ্রোহী'যুগের রচনা, অনবদ্য নয়। শ্রেষ্ঠ কবিদের বিশেষ বিশেষ কবিতায় কবি-কল্পনার যে পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পায় নজরুলের রচনায় সেটির অভাব মাঝে মাঝে প্রায় বেদনাদায়ক হয়েছে। নজরুল যে পূর্ণাঙ্গ কবিতার রচয়িতা তেমন নন, তাঁর কবি-প্রতিভা বরং প্রকাশ পেয়েছে উৎকৃষ্ট চরণের রচনায়, এ উক্তি করা যেতে পারে (ওদুদ ১৯৮৩: ৮৩)।

শুদ্ধমাত্র এই প্রবাদপ্রতিম প্রবচনটি রচনা করিয়াই কাজী আবদুল ওদুদ অবসর গ্রহণ করেন নাই। নজরুল প্রসঙ্গে তিনি আরো একটা বিচার রাষ্ট্র করিয়াছিলেন।

> 'বিদ্রোহী'-যুগ নজরুলের জন্য জনপ্রিয়তা আনলেও তাঁর কাব্য-সাধনা ব্যাপক সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর গানে, এ বিষয়ে বাংলার কাব্যরসিকরা বোধ হয় একমত। রেখাপাতের যে অপরিচ্ছন্নতা 'বিদ্রোহী'-যুগের অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনায় লক্ষ্য করা গেছে, তা যে 'গানে'র যুগে প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে, শুধু অনবদ্য চরণ নয় অনবদ্য কবিতা তাঁর কলম থেকে উৎরেছে, তা মিথ্যা নয় (ওদুদ ১৯৮৩: ৮৮)।

মাত্র এইটুকু বলিয়াই আবদুল ওদুদ তৃপ্ত হন নাই। তিনি একটা ভবিষ্যদ্বাণী পর্যন্ত করিয়াছিলেন। নজরুল ইসলামের 'কবি-জীবনের অবসান ঘটাও বিচিত্র নয়' বলিয়া একটা আশঙ্কা তিনি নিজের অজ্ঞানলোক হইতে বাহির করিয়াছিলেন। এ কথা সত্য যে নজরুল ইসলাম ঠিক নিজের আখেরটা গোছাইতে পারেন নাই। তাঁহার আখের অগোছালোই থাকিয়া গিয়াছিল। আবদুল ওদুদের জবানিতেই না হয় বলি: '... তাঁর আধুনিক জীবনের পরিণতি কোথায়, বলা সোজা নয়। এর ফলে তাঁর কবি-জীবনের অবসান ঘটাও বিচিত্র নয়—যে তাত্ত্বিকতা তাঁর জীবনের মর্মমূলে আমরা দেখেছি তাই হয়ত জয়ী হবে পূর্ণভাবে। অথবা, এর ফলে সমৃদ্ধতর চিত্ত ও তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি নিয়ে তিনি নূতন করে জীবনে ও সাহিত্যে প্রবেশ করতে পারেন' (ওদুদ ১৯৮৩: ৯০)।

আবদুল ওদুদের সিদ্ধান্তটা ছিল বড়ই শোচনীয়। তাঁহার মতে, নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক মর্যাদা ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না, তবে তাঁহার একটা 'ঐতিহাসিক মর্যাদা' সহজেই চোখে পড়ে। সাহিত্যিক মর্যাদা না থাকিলেও ঐতিহাসিক মর্যাদা থাকিবে কিভাবে? রহস্যের সমাধানটা তিনিই বাতলাইলেন: 'জনজাগরণের দিক' হইতে আসে এই মর্যাদা।

নজরুল ইসলাম সম্পর্কে আবদুল ওদুদের শেষ প্রতিপাদ্য গোটা দুই প্রস্তাবে বিবৃত হইয়াছে। এক নম্বরে তিনি সত্য সত্যই ধরিতে পারিয়াছেন, 'নজরুল এ-যুগের বাঙালী জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রধানত জড়তার বিরুদ্ধে বারবার সংগ্রাম ঘোষণা করে' ও নির্যাতিত জনসাধারণের পক্ষ সমর্থন করে'; আর মুসলমান-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের মনে নব নব আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করে', বিশেষ করে বাংলার বা ভারতের আবহমান প্রাণধারার সঙ্গে তাদের প্রেমের নিবিড় যোগ স্থাপন করবার আহ্বান জানিয়ে' (ওদুদ ১৯৮৩: ৯০)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল ওদুদের দ্বিতীয় প্রস্তাবটা আরো মজার: 'সেই প্রেমের সাধনাই মুখ্যত নজরুলের সাধনা হয়েছে। দেশ ও জাতির প্রতি সেই প্রেমে, সেই পূর্ণ আত্মনিবেদনে নজরুল এ-কালে মুসলমানদের মধ্যে, অথবা হিন্দু-মুসলমান সবার মধ্যে, এক সম্মানিত ব্যক্তি—যে বৃহৎ জীবনের অথবা জাতীয় জীবনের চেতনা দেশে অনুভূত হয়েছে তাতে তাঁরও প্রতিভার স্পর্শ লেগেছে। এই জনজাগরণের দিক দিয়ে দেখলে সহজেই চোখে পড়ে নজরুলের ঐতিহাসিক মর্যাদা কত বড়' (ওদুদ ১৯৮৩: ৯০-৯১)।

ঐতিহাসিক মর্যাদা বলিতে কাজী আবদুল ওদুদ সত্য সত্য কি বুঝাইলেন তাহা কিছু পরিমাণে অপরিচ্ছন্নই রহিয়া গিয়াছে। তবে তাঁহার লেখায় যে অসামান্য রাখঢাক তাহা অনাবৃত করিলে মোটা দাগে কয়েকটা প্রস্তাব আলাদা করা যাইতে পারে। প্রথমেই তিনি মনোযোগ দিয়াছিলেন নজরুল ইসলামের মনোবিশ্লেষণে। সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নজরুল ইসলাম ছিলেন 'একজন অসাধারণ ভাববিলাসী ও অভিমানী, ব্যর্থপ্রেমের বেদনায় গভীরভাবে আহত' কবিবিশেষ; অবলম্বন করিয়াছিলেন 'এক দায়িত্বহীন ভবঘুরের জীবন'। আবদুল ওদুদের জবানিতেই শুনি:

> 'বিদ্রোহী' থেকে তাঁর মানসজীবনের গতি যে-মুখী হলো তার সঙ্গে তাঁর পূর্বের ভাব-জীবনের সঙ্গতি অসঙ্গতি দুইই রয়েছে। তাঁর এই যুগের একটি বিশিষ্ট রচনা তাঁর 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাস। এতে কবি যে তাঁর তরুণ জীবন কিছু পরিমাণে চিত্রিত করেছেন, অনেকে বোধ হয় তা জানেন। এই রচনায় দেখা যাচ্ছে—কবি একজন অসাধারণ ভাববিলাসী ও অভিমানী, ব্যর্থপ্রেমের বেদনায় গভীরভাবে আহত। কিন্তু এই আঘাত যত বড়ই হোক এতে মুহ্যমান তিনি হননি। এই নিষ্করুণ আঘাতে তাঁর অন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে একটি মধু-স্রোত; কিন্তু এতে লাঞ্ছিত এমন কি ম্রিয়মানও তিনি হননি। তবে তিনি অবলম্বন করেছেন এক দায়িত্বহীন ভবঘুরের জীবন—সেই দায়িত্বহীনতায় তাঁর সুনিবিড় আনন্দ (ওদুদ ১৯৮৩: ৮০)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল ওদুদ হয়ত নিজের অজান্তে এক মুখে দুই কথাই কহিয়াছিলেন। উপরের মুখটি ছাড়াও তিনি আরেক মুখে কহিয়াছেন, '"বিদ্রোহী" প্রকাশের পূর্বেই তাঁর নবীনতা অথবা উদ্দামতা আর ছন্দ-সামর্থ্যের প্রতি বাংলার সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।' স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে—কি কারণে? আবদুল ওদুদ কবুল করিয়াছেন, 'সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ আর "বিদ্রোহী" রচনা এর মধ্যে কালের ব্যবধান সামান্য—বোধ হয় দুই বৎসরের বেশী নয়।' ওদুদের চোখে পড়িয়াছে, নজরুল ইসলাম গড়িয়া উঠিতেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছায়ায়, সত্যেন্দ্রনাথের হাওয়ায়, আর 'ইরানী-কবিতিলক' হাফিজের প্রেমে উন্মাদ অবস্থায়। তাঁহার কথায়, 'আর এক শ্রেণীর ভাবুকদের প্রতিও কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল—তাঁরা বাংলার সন্ত্রাসবাদীর দল' (ওদুদ ১৯৮৩: ৮১)।

এত কিছুর মধ্যে বসিয়াও তিনি কি করিয়া 'ঐতিহাসিক মর্যাদা' লাভের যোগ্য হইয়া উঠিলেন তাহা কিন্তু ওদুদ বিশদ করেন নাই। এতক্ষণে তিনি বিষাদে মজিয়া ইঙ্গিত করিলেন: '... "বিদ্রোহী" প্রকাশের পূর্বেই "শাতিল আরব" "মোহর্‌রম" "কোরবাণী" প্রভৃতি যে-সব জনপ্রিয় কবিতা তিনি লিখেছিলেন সে-সবে ব্যক্ত হয়েছিল মুসলমানসমাজের গতানুগতিক জীবনের প্রতি ধিক্কার, এক বলিষ্ঠ নব জীবনারম্ভের জন্য তীব্র কামনা, আর অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি ও মহিমায় তাঁর প্রত্যয়। এটি ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য খেলাফত যুগ' (ওদুদ ১৯৮৩: ৮১)।

এই খেলাফত যুগটা যে কোন পদার্থ তাহা আবদুল ওদুদ নির্দেশ করিয়াছিলেন এইভাবে:

> স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার হিন্দুর যে সাফল্য, মুখ্যত তাইই প্রেরণা জুগিয়েছিল মুসলমানের এই খেলাফত আন্দোলনে। কিন্তু হিন্দুর আয়োজনের ব্যাপকতা তাঁদের ছিল না, ফলে সফলতা তাঁদের জন্য হচ্ছিল সুদূরপরাহত। তাঁদের কেবল লাভ হচ্ছিল দিগ্‌দেশবিহীন এক বিক্ষুব্ধ মানসিকতা। তরুণ নজরুল, অর্থাৎ 'বিদ্রোহী' রচনার পূর্বের নজরুল, এক হিসাবে ছিলেন এই খেলাফত-যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। তাঁর 'মোহর্‌রম'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার অধুনা-পরিত্যক্ত শেষ দুটি চরণ এই সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে—

দুনিয়াতে দুর্মদ খুনিয়ারা ইসলাম—
লহু লাও, নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম।

কিন্তু 'বিদ্রোহী'তে তাঁর মানসিক কুয়াসা এতখানি কেটে যায় যে, তিনি যেন এক নতুন জীবন নিয়ে জেগে ওঠেন, নিজেকে ও জগৎকে দেখ্‌তে আরম্ভ করেন এক নতুন দৃষ্টিতে (ওদুদ ১৯৮৩: ৮২)।

'আত্মকেন্দ্রিক পুনরাবৃত্তি' অথবা অসহযোগ আন্দোলনের কবি

কাজী আবদুল ওদুদের প্রায় একই সুরে হুমায়ুন কবিরও দেখি প্রায় একই মত প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার মতানুসারে, নজরুল ইসলাম ছিলেন শেষবিচারে অসহযোগ আন্দোলনের কবি; তাঁহার প্রতিষ্ঠার সহিত অসহযোগ আন্দোলনের যোগাযোগটা প্রায় প্রত্যক্ষ। হুমায়ুন কবির লিখিতেছেন:

... রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের কবি নন, এবং কেন নন তারও কারণ আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। অসহযোগ আন্দোলনের আলোড়ন বাঙলা কাব্যে বোধ হয় নজরুল ইসলামের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী জেগেছিল, এবং সেইজন্যই বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তাঁর এত প্রতিষ্ঠা। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রসঙ্গেও ব্যক্তিগত প্রতিভার বিচার অবান্তর, কারণ প্রতিভা সকল ক্ষেত্রেই অলৌকিক হলেও সামাজিক প্রতিবেশেই তার প্রকাশ। তাই সাহিত্যবিচারে একমাত্র সামাজিক পশ্চাদপট নিয়েই আলোচনা চলতে পারে (কবির ১৩৬৫: ৮৯)।

কাব্য-সাধনায় নজরুল ইসলামের সিদ্ধি কি অসিদ্ধি হুমায়ুন কবিরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান বিবেচ্য ছিল না। তাঁহার বিবেচনায় ছিল সমাজ জীবনের ঐক্য কিংবা অনৈক্য। সেকালের সমাজ জীবনের অনৈক্যের মধ্যেই তিনি যেমন রবীন্দ্রনাথের অসারতা দেখিয়াছেন তেমনি একই সমাজ জীবনের ঐক্যের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইয়াছেন নজরুল ইসলামের সারমর্ম। তাঁহার ব্যাখ্যা ষোল আনা অভিনব না হইলেও আমাদের অব্যয় বিবেচনার যোগ্য। সেই কারণেই এখানে একটু চওড়া উদ্ধৃতির আশ্রয় লইতে হইতেছে:

> অসহযোগ আন্দোলনের যুগে ভারতবর্ষের জীবনধারায় যে বিপুল আলোড়ন, জাতির প্রায় সমস্ত স্তরকেই তা স্পর্শ করেছিল। মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রবলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ যেন আসন্ন হয়ে উঠল, দিকে দিকে তার চাঞ্চল্য নির্জ্জীবকেও চঞ্চল করে তুলল। বাঙলাদেশে কিন্তু এ জাগরণের যুগেও স্বদেশী যুগের মতন সমৃদ্ধ সাহিত্য না দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—তার কারণ কি (কবির ১৩৬৫: ৮৯)?

সমাজ গড়নের বিশ্লেষণযোগে নিজের প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই খুঁজিয়া লইয়াছিলেন। আরো খোলাসা করিয়া বলিলে, খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন সমাজের অধিপতি তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির শ্রেণিচরিত্র এবং তাহার মানস গড়নে। হুমায়ুন কবিরের বিশ্লেষণ খানিকটা প্রণিধান করা যাইতে পারে। তিনি লিখিতেছেন:

> হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী-মানস উনিশ শতকে নিজেকে বিকশিত করেছিল। বিংশ শতকের গোড়ায় পৃথিবীর সর্বত্র মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশের সম্ভাবনা যখন ফুরিয়ে এল, তখন বাঙলাদেশের অপেক্ষাকৃত পরিণত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেই তার প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বঙ্গ-ভঙ্গরোধ উপলক্ষ হলেও স্বাধীন স্বাজাতিক রাষ্ট্রস্থাপনই ছিল স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত এবং ব্যাপক লক্ষ্য। উপলক্ষ সাধিত হল কিন্তু লক্ষ্য পূর্ব্বের মতনই দূরপরাহত হয়ে রইল বলে স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপক পরাজয়ে এই শ্রেণী তার আত্মবিশ্বাসও অনেকখানি হারিয়েছিল। তাই অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান যখন এল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন গণশক্তির প্রচণ্ড আলোড়নে তার শ্রেণী-মানস স্ববিরোধী দ্বন্দ্বে বিভক্ত হয়ে পড়ল (কবির ১৩৬৫: ৮৯-৯০)।

অখিল ভারতের সাধারণ পরিস্থিতির সহিত হুমায়ুন কবির পরাধীন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশেষ গড়নের দিকেও দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই দৃষ্টির মধ্যে তিনি যুগপদ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলেন, স্বদেশি আন্দোলনের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন অধিকক্ষণ অসহযোগ আন্দোলনের কবি রহিলেন না আর নজরুল ইসলামই বা কি করিয়া ঐ আন্দোলনের কবি হইয়া উঠিলেন। হুমায়ুন কবির উবাচ:

পূর্ব্বেই আমরা দেখেছি যে চাকুরী ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙলায় মধ্যবিত্তশ্রেণীর অস্বাভাবিক স্ফীতি ঘটেছিল। তার ফলে বাঙলার হিন্দু জনসাধারণের দু কোটী আড়াই কোটী লোকের মধ্যে প্রায় সত্তর আশী লক্ষ মধ্যবিত্তশ্রেণী-সম্ভ্রমের দাবী রাখে। এটাও লক্ষণীয় যে পশ্চিমে যেমন ব্রাহ্মণের মধ্যেও ভূঁইহারী শ্রেণীর পরিচয় মেলে, বাঙলাদেশে তার কোন নমুনা নেই। এখানে আর্থিক অবস্থা যাই হোক না কেন, বর্ণহিন্দু মাত্রই মধ্যবিত্তশ্রেণী-ভুক্ত। শিক্ষার বিস্তারে হিন্দু সমাজের এ অন্তর্বিভাগ আরও বিস্তৃত হয়েছে, তার প্রতি ইঙ্গিতও আমরা করেছি। বাঙলায় যে গত পনেরো ষোল বৎসর রাজনৈতিক মতানৈক্য এবং কর্ম্মপন্থার নানা সঙ্কট, তারও কারণ হয়তো সামাজিক এই পরিস্থিতির মধ্যেই মেলে। সাহিত্যিক ব্যাপারেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট এবং সেইজন্যই অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙলাদেশে সবল ও সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়ে ওঠেনি (কবির ১৩৬৫: ৯০-৯১)।

কাজী আবদুল ওদুদের মতন হুমায়ুন কবিরও দেখি শেষ পর্যন্ত স্থির করিয়াছিলেন, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা কালের ধোপে টিকিবে না। পার্থক্যের মধ্যে তিনি নজরুলের সহিত জসীম উদ্‌দীনের—তাঁহার বানানে 'জসিমুদ্দিনে'র—নামটিও জড়াইয়াছিলেন। হুমায়ুন কবিরের বিচার মোতাবেক, 'পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই' নজরুল ইসলামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিভার পরিচয় মিলিবে, নতুন কোন দিকদেশ রচনার সাধ্য উঁহার হয় নাই। কবিরের জবানবন্দি অনুসারে, 'মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী সে সময়ে অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং সেইজন্য আশাবাদী। তার সামাজিক সত্তাও নানা কারণে দ্বিধাবিভক্ত হয়নি। সমাজ-জীবনের এই ঐক্যে নজরুল ইসলামের প্রতিশ্রুতির মূল প্রতিষ্ঠিত, এবং সেইজন্যই দেখি যে নিপীড়িত জনমানসের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার সাধনা তাঁর রচনায় সবল কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল' (কবির ১৩৬৫: ৯১)।

হুমায়ুন কবিরের দোসরা প্রস্তাবটি ছিল এইরকম:

> ঐতিহ্যের লঙ্ঘন তিনি করেননি—পুরাতন পুঁথিসাহিত্যের আবহাওয়ায় লালিত বলে বাঙলার বিপুল মুসলমান কৃষক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সহজ আত্মীয়তা। ভাষা ও ভঙ্গীতে নজরুল ইসলামের কাব্যে যে বিপ্লবধর্ম্ম, পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই তার পরিচয় মেলে। দেশের গণ-মানসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাব্যে যতটুকু রূপান্তরিত করতে পেরেছেন, জসিমুদ্দিনের কাব্য-সাধনায়ও ঠিক ততখানিই সিদ্ধি। উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চাদমুখী বলে সে শক্তি কল্পনা ও আবেগের নতুন নতুন রাজ্য জয়ে অগ্রসর হতে পারেনি। মানস-সংগঠনে রূপান্তর হয়নি বলে দুজনের বেলায়ই সৃজনী-প্রতিভা অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে এল। আজ আত্মকেন্দ্রিক পুনরাবৃত্তির মধ্যেই তাঁদের সাধনা নিবদ্ধ (কবির ১৩৬৫: ৯১)।

হুমায়ুন কবির জানিতেন, নজরুল ইসলামের কিংবা জসীম উদ্‌দীনের এই অনর্থ শুদ্ধ তাঁহাদের একেলার অনর্থ ছিল না । কথাটা তিনি আগেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন: '... সাহিত্যবিচারে একমাত্র সামাজিক পশ্চাদপট নিয়েই আলোচনা চলতে পারে।' এই পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার সিদ্ধান্ত হতাশাজনক হওয়াই অনিবার্য ছিল। তিনি লিখিয়াছেন:

> কালধর্ম্মে মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্প্রসারণের সম্ভাবনা অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সেইজন্য বর্ত্তমান সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে মুসলমানসমাজে মহৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির আবির্ভাবের সম্ভাবনাও অত্যন্ত অল্প। যে প্রতিভার শক্তি এই সংকীর্ণ পশ্চাদপটের সম্প্রসারণ ও রূপান্তর আনতে পারে, বর্ত্তমানে তার সমস্ত উদ্যম সমাজ-সংগঠনের কাজেই বোধ হয় ব্যয় হয়ে যায়, সাহিত্যসৃষ্টির জন্য আর কিছু বাকী থাকে না। সেইজন্যই সাম্প্রতিক বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রায় সকলেই পশ্চাদমুখী এবং নতুনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রাচীনপন্থী। সাহিত্যের আঙ্গিক নিয়ে নতুন পরীক্ষা করবার উদ্যম তাঁদের নেই, সমাজব্যবস্থার রূপান্তরে নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভাবনায়ও তাঁদের কল্পনা বিমুখ (কবির ১৩৬৫: ৯১-৯২)।

'মহিমার অবসান' অথবা বর্তমানের কবি

শুদ্ধ কাজী আবদুল ওদুদ কিংবা হুমায়ুন কবির নহেন, আরো অনেকেই এই সত্যে সন্দেহ রাখেন যে নজরুলের সঙ্গেই আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন, গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি নজরুল ইসলাম 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। এই কবিতার অর্থ তাঁহারা জানেন বলিয়া আজও মনে হয় না। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করি, অনুগ্রহ করিয়া জার্মান তত্ত্বজ্ঞানী বাল্টার বেনিয়ামিন রচিত 'পুনর্জননী কলাকৌশলের যুগে শিল্পকলা' নামক প্রবন্ধটি পড়িবেন (বেনিয়ামিন ২০০৬ক)। এই প্রবন্ধের সার প্রস্তাব অনুসারে মহিমার অবসানেই মাত্র আধুনিকতার জন্ম।

মহিমার চারিটি অঙ্গ বেনিয়ামিন নির্দেশ করিয়াছিলেন: এইগুলির অপর নাম যথাক্রমে, ১. সৃজনশীলতা, ২. প্রতিভা, ৩. চিরকালের মর্যাদা এবং ৪. বোধাতীতের হাতছানি। বেনিয়ামিনের মাত্র এক দশক আগেই নজরুল এই সত্যে সহজ ভ্রমণ করিয়াছিলেন (ইসলাম ১৯৬৭)। তাহাতে কি সন্দেহ আছে!

কাজী নজরুল ইসলামের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাই প্রমাণ করে কবিতায় মহিমার অবসান অর্থাৎ আধুনিক বাংলা কবিতার তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠা তাঁহার হাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। মহিমার অবসানেই আধুনিকতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূত্রপাত—ইহার উদাহরণ বাল্টার বেনিয়ামিন ফরাশি কবি শার্ল বোদলেয়ারের কবিতায় খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন (বেনিয়ামিন ২০০৬খ)। আমরা নজরুল ইসলামে ইহাই দেখিয়াছিলাম।

ডিসেম্বর ২০১৮

দোহাই

১ কাজী নজরুল ইসলাম, 'আমার কৈফিয়ৎ,' *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭), পৃ. ৪১-৪৪।

২ কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ*, ২য় সংস্করণ (ঢাকা: ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩)।

৩ হুমায়ুন কবির, *বাঙলার কাব্য*, ২য় সংস্করণ (কলিকাতা: চতুরঙ্গ, ১৩৬৫)।

৪ Walter Benjamin, 'The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility [Third Version],' trans. Harry Zohn and Edmund Jephcott, in *Selected Writings*, vol. 4: 1938-1940, trans. Edmund Jephcott et al., eds. Howard Eiland and Michael W Jennings (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006ka), pp. 251-83.

৫ _____ *The Writer of Modern Life: Essays on Charles Baudelaire*, trans. Howard Eiland et al., ed. Michael W Jennings (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006kha).

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

জাতির নামে বজ্জাতি

হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতেই জাতির জান
তাই ত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে এক শ'-খান!

—কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৬৬: ৮৯)

কাজী নজরুল ইসলাম এখন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া গণ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শুইয়া আছেন। সেখানে—তাঁহার সমাধিসৌধের গায়ে—তাঁহার নামের আগে 'জাতীয় কবি' উপাধিটিও উৎকীর্ণ আছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, জাতীয় কবি বলিতে কি বোঝায়? কবি তিনি জাতীয়—এ সত্যে সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে দোষ কোথায়, কোন জাতীয় কবি তিনি? আরো বাংলা করিয়া বলিতে, নজরুল ইসলাম কোন জাতির কবি? ১৯৪৭ সালের পর হইতে কাজী নজরুল ইসলামের জাতীয়তা লইয়া যে তর্কবিতর্ক চলিয়া আসিতেছে ১৯৭১ সালের পর আমরা আবারো কি সেই দিকেই ফিরিয়া গিয়াছি? নাকি নতুন কোন জাতীয় বিতর্কের সূচনা হইয়াছে? আজিকার নিবন্ধে সেই কথাটি তুলিবার ইচ্ছা রাখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

বর্তমান বাংলাদেশ যে চারি সীমানার মধ্যে গঠিত হইয়াছে সেই সীমা ধরিয়া কোন রাষ্ট্র গঠিবার চিন্তা কাজী নজরুল ইসলাম কখনো করেন নাই। যে যুগে তিনি জন্মিয়াছেন সে যুগে আর কেহ বা এমন চিন্তা করিয়া থাকিবেন কিনা বলিতে পারি না। তবে আমাদের যুগের একজন চিন্তাশীল লেখক একটা হক কথা লিখিয়াছেন। লেখকের নাম সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক পদ হইতে ইনি অপসৃত হইয়াছিলেন। ১৯৮৬ সালের ২ এপ্রিল ঢাকায় আকস্মিকভাবে মারা যাইবার কয়েক মাস পর 'বাংলার কথা' নামে তাঁহার একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের বহি বাহির হয়। সেই বহির 'নজরুল প্রসঙ্গ' নামক নিবন্ধে তিনি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে লিখিতেছেন, 'তিনি যে বাংলায় চারণ করেছেন সে আজকের এই বাংলা নয়, সে বাংলা ছিল ব্রিটিশশাসিত অখণ্ড ভারতের অখণ্ড বাংলা, যার ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তি ঘটেছে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট' (হোসেন ১৯৮৬: ৭৮)।

নজরুল ইসলামের সক্রিয় জীবন শেষ হয় ১৯৪২ সালে। তারপর আরো চৌতিরিশ বছর তিনি নিষ্ক্রিয় প্রাণ লইয়া জীবিত ছিলেন—এ কথা অসত্য নহে। তবে সেই সময়ে ভারতে, পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে অনেক রক্ত গড়াইয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষে, মহামারিতে, দাঙ্গায় আর যুদ্ধে অনেক প্রাণ ঝরিয়াছে। ধরিয়া লইতে হইবে, এসব ঘটনা ঘটিয়াছে 'জীবিত নজরুলের অজ্ঞানে'। তারপরও অস্বীকার করা যাইবে না, নজরুল ইসলামকে কেন্দ্র করিয়া নতুন নতুন জাতীয় বিতর্কের সূচনা হইয়াছে। পাকিস্তান কায়েমের পর কবি গোলাম মোস্তফা প্রচার করিয়াছিলেন, '... নজরুলের কাব্যাদর্শ যদি বাঙালি মুসলমানেরা গ্রহণ করিত তবে ভারত স্বাধীন হইত, কিন্তু মুসলমানেরা পাকিস্তান অর্জন করিতে পারিত না' (দ্রষ্টব্য, উদ্‌দীন ২০০৩: ১১০)। গোলাম মোস্তফার প্রস্তাবটি আমি এখানে কবি জসীম উদ্‌দীনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবানি অনুসারে লিখিলাম। জসীম উদ্‌দীন সাক্ষ্য দিয়াছেন, পাকিস্তান হাসেল হইবার পর গোলাম মোস্তফা দেশের রাষ্ট্রভাষা হিশাবে উর্দুকেই সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কারণ। সকল কথা এক নিবন্ধে বলা যাইবে না।

গোলাম মোস্তফার প্রস্তাব ছিল, নজরুল ইসলাম পাকিস্তানের কবি নহেন। তাঁহার ভাষায়, 'পাকিস্তানের কবি হওয়া তো দূরের কথা, নজরুল ছিলেন ঘোর পাকিস্তান বিরোধী' (মোস্তফা ১৯৬৮: ২৫১)। এই প্রস্তাব বিক্রয় করা কালক্রমে কঠিন প্রমাণিত হইল। অন্যদিকে আবুল মনসুর আহমদ দাবি করিয়াছিলেন, নজরুল ইসলামই পাকিস্তানের আসল প্রেরণাদাতা। তাঁহার কথায়, 'পাকিস্তান হাসিল একটা গণ-বিপ্লব। আর সব গণ-বিপ্লবের মতোই পাকিস্তান-বিপ্লবের শক্তির উৎস ছিল গণ-মনের প্রস্তুতি। মুসলিম-বাংলার গণ-মনে এই প্রস্তুতি এনেছিল নজরুল ইসলামের গান ও কবিতা।' মানুষ অলংকার-পছন্দ প্রাণী। আবুল মনসুর আহমদ তাই আরো অলংকার দিয়া লিখিলেন:

> নজরুল ইসলাম একদিন বিজলী নোটিশে 'আল্লাহু আকবর' তকবীরের হায়দারী হাঁক মেরে ঝড়ের বেগে এসে বাংলা-সাহিত্যের দুর্গ জয় ক'রে বসলেন। মুসলিম-বাংলার ভাঙ্গা কিল্লায় নিশান উড়িয়ে দিলেন। একদিনে দূর ক'রে দিলেন মুসলিম-বাংলার ভাষা ও ভাবের হীনমন্যতা। মনের দিক থেকে জাতীয় জীবনে এ একটা বিপ্লব। এ বিপ্লবের একমাত্র ইমাম নজরুল ইসলাম (আহমদ ১৯৬২: ১১১)।

এই জাতীয় যুক্তির কাছে মাথা নত করিয়া পাকিস্তান বিপ্লবের নেতারা নজরুল ইসলামকে ভালবাসিবার নীতি গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা নজরুলের 'সত্যিকার কল্যাণ' কামনা করিলেন। তাঁহাকে পাকিস্তানি বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তবে এই বাবদ মূল্যও আদায় করিলেন একটা। এই 'সত্যিকার কল্যাণ' কামনার অংশস্বরূপ তাঁহারা নজরুলের কবিতার বিশাল 'অবাঞ্ছিত অংশ' বাদ দিয়া তাঁহাকে 'কেবল মাত্র ইসলাম ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম রেনেসাঁর কবি' বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কবি ফররুখ আহমদ গোলাম মোস্তফা পথের পথিক ছিলেন না। তিনি বলিলেন, 'বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে এই দেশে ইসলামী সংস্কৃতিকে হত্যা করা হবে' (আহমদ ১৯৯৬: ৩৩০)। অনেক সংকোচের পরও তিনি কবুল করিলেন, '... পলাশী যুদ্ধের পর নজরুল ইসলাম বাঙালী মুসলমানের জাগরণের প্রথম কবি।' তবে এ কথা স্মরণ করাইতে ভুলিলেন না যে ভারতের পশ্চিম প্রান্তের মহাকবি ইকবালের 'দেশকালজয়ী প্রতিভার সঙ্গে নজরুলের তুলনা করতে যাওয়া বাতুলতা' বৈ নয় (আহমদ ১৯৯৬: ৩২৭)।

২

আমরা জানি, কাজী নজরুল ইসলাম শুধু কবিতা লিখিয়াই কর্তব্য শেষ করেন নাই; সরাসরি রাজনীতিতেও যোগ দিয়াছিলেন। সে যুগের মূল রাজনীতি ছিল পরাধীনতার কবল হইতে দেশকে স্বাধীন করিবার রাজনীতি। জাতির চারি সীমানার মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আর পরাধীনতার হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার সংগ্রাম সেই কারণে একই সুতায় গাথা। নজরুল ইসলাম এই কারণেই একদিকে শ্রমিক ও কৃষকের সহিত একাত্ম হইয়াছিলেন, অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি ধর্মীয় ক্ষেত্রের ব্যবধান কমাইয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার কর্তব্যও পালন করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, নজরুল ইসলামের এই সাধনায় অনেকেই সন্তুষ্ট হন নাই। জাতি বলিতে যাঁহারা শুদ্ধমাত্র মুসলমান—নিছক বাঙালি মুসলমানও নয়—বুঝিতেন তাঁহারা নজরুল ইসলাম প্রণীত এই হিন্দু-মুসলমান মিলনের দাবি দেখিয়া বড় সুখী হন নাই।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কোন একদিন ফররুখ আহমদ লিখিয়াছিলেন, 'খিলাফৎ আন্দোলন-কালে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব একাধিক কারণে স্মরণীয়। আত্মবিস্মৃত জাতি বহুদিন পরে শুনলো তার আশা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাঙ্ক্ষার কথা। নতুন করে পেল সে তার ঐতিহ্যের পরিচয়' (আহমদ ১৯৯৬: ৩২৮)। তাঁহার ধারণা, এই পরিচয়দান সত্ত্বেও নজরুল ইসলাম শেষ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান সমাজের দাবি পুরাপুরি মিটাইতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষায়, '... নজরুলের সহজ স্বীকৃতি ও অবহেলা বাঙালী মুসলমান সমাজের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে, কারণ তারা আরও চেয়েছিল নজরুলের কাছে, তারা তাদের নিজের দর্শন, জীবনবোধ ও ইতিহাসের অভিব্যক্তি চেয়েছিল কবি নজরুলের কবিতায়' (আহমদ ১৯৯৬: ৩২৭)।

ফররুখ যাহা ভদ্রজনোচিত, শোভন ভাষায় লিখিয়াছেন তাহার সুলভ সংস্করণ পাওয়া যাইতেছে গোলাম মোস্তফার লেখায়:

> নজরুলকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু নজরুলের সবচেয়ে বড় অপবাদ যদি কিছু থাকে, তবে এই। নজরুল যা নন, তাঁর উপর তাই আরোপ করিলে তাঁকে হেয় করা হয়। পাকিস্তানের কবি হওয়া তো দূরের কথা, নজরুল ছিলেন ঘোর পাকিস্তান বিরোধী। তিনি গাহিয়াছিলেন 'অখণ্ড ভারতের' গান, তিনি দেখিয়াছিলেন হিন্দু-মুসলমান কৃষ্টির 'হরগৌরীরূপ', ভারত জুড়িয়া হিন্দু স্বাধীনতার যে সাধনা চলিতেছিল, নজরুল আসিয়া সেই সুরেই তাঁহার কণ্ঠ মিশাইয়া গান গাহিয়াছিলেন। সে-যুগের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকেই তিনি তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলিম জাতির জন্য তিনি নূতন করিয়া কিছু ভাবেন নাই (মোস্তফা ১৯৬৮: ২৫১-৫২)।

গোলাম মোস্তফা দুঃখ করিলেন: 'ইকবাল পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিলেন এমন যুগে—যখন ভারতের মুসলমানদের কোনো বলিষ্ঠ আত্মচেতনাই ছিল না। আশ্চর্যের বিষয়, নজরুল ইসলাম সেই ইকবাল-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিতে পারিলেন না! তিনি দেখিলেন কিনা ভারত-লক্ষ্মীর স্বপ্ন! নজরুল ইসলামের পক্ষে এ এক মস্তবড় দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে' (মোস্তফা ১৯৬৮: ২৫৯)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাগুলি গোলাম মোস্তফা লিখিয়াছিলেন ইংরেজি ১৯৫০ সালে। একই বছর তিনি প্রস্তাব দিয়াছিলেন, নজরুল ইসলামকে কলিকাতা হইতে লইয়া আসিতে হইবে। গোলাম মোস্তফার ইচ্ছা পূরণ হইয়াছিল। তবে অনেকদিন পর—স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম হইবারও পরে।

গোলাম মোস্তফা নজরুল ইসলামের কবিতার একটি পাকিস্তানি সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাবও দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, ঐ সংস্করণে নজরুল কাব্যের 'অবাঞ্ছিত অংশ'গুলি থাকিবে না। আমাদের সৌভাগ্য, বাংলাদেশে তো বটেই—তৎকালীন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানেও—এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পুরাপুরি আমল করা হয় নাই। গোলাম মোস্তফা লিখিয়াছিলেন: 'নজরুলের সত্যিকার কল্যাণ আমরা কামনা করি এবং সেই জন্য তাঁহাকে পাকিস্তানে লইয়া আসিয়া অথবা বিদেশে পাঠাইয়া তাঁহার সুচিকিৎসার প্রস্তাব আমরা দিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যের একটা পাকিস্তানী সংস্করণ প্রকাশ করার প্রস্তাবও আমরা করিয়াছি' (মোস্তফা ১৯৬৮: ২১৯)।

গোলাম মোস্তফা নজরুলের কবিতায় যে 'অবাঞ্ছিত অংশ' খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহার আট বছর আগে একদিন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন একই কারণে সপ্তদশ শতকের কবি সৈয়দ আলাওলকেও বাতিল ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন:

> ঐতিহাসিক বিচারে, বাংলায় মুসলিম সাহিত্যের সূচনা আলাওল থেকেই হওয়া উচিত। কিন্তু আলাওলের সাহিত্যে মুসলিম সমাজের প্রতিচ্ছবি নেই। তিনি একান্তভাবে হিন্দুভাবাপন্ন। তাই সহধর্মী হলেও তিনি আমাদের সগোত্র নন। তাঁর স্থান আমাদের থেকে একটু দূরে। তাঁর সাহিত্য নিয়ে আমাদের গর্ব করা সাজে, কিন্তু তাঁর নিকট হতে অনুপ্রেরণা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। আমাদের প্রয়োজন যে জাতীয় সাহিত্যের, যার উদ্ভব আমাদের সামাজিক জীবন থেকে, আলাওল সেইরূপ কোন সাহিত্য আমাদের প্রদান করেননি। তিনি সম্মানার্হ, কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করা চলে না (হোসায়েন ১৯৬৮: ১০৬)।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা কি বস্তু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তাঁহাদিগকে সবিনয়ে বলিব সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের এই আহ্বান পাঠ করিবেন—সাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে হাতেনাতে চিনিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য নহে, এই আহ্বান ১৯৪৩ সালের। আপনারা লক্ষ্য করিবেন, 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে'র সভাপতি মহোদয় 'সমিতির সভাপতির আহ্বান' নামক এই ভাষণে কাজী নজরুল ইসলামের নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই।

নজরুল ইসলাম ছিলেন কায়মনোবাক্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সৈনিক। সেই অর্থে তাঁহাকে 'জাতীয়তাবাদী' আখ্যা দেওয়াটা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। যুগের ধর্ম অনুসারে তিনি যদিও ছিলেন সর্বভারতীয়—কিংবা কমসে কম অখণ্ড বাংলার—জাতীয়তাবাদী, তথাপি অখণ্ড বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের দুর্দশার কথাও তিনি কখনো ভোলেন নাই। নজরুল ইসলাম বাঙালি মুসলমানের উন্নতি চাহিয়াছেন, কিন্তু মুসলমান জাতীয়তাবাদীর ভেক তিনি কদাচ ধারণ করেন নাই। সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন সঠিকই বলিয়াছেন:

> একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ে নজরুলের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা স্বভাবতই তাঁকে ঐক্যবদ্ধ সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি যে বাংলায় চারণ করেছেন সে আজকের এই বাংলা নয়, সে বাংলা ছিল ব্রিটিশশাসিত অখণ্ড ভারতের অখণ্ড বাংলা, যার ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তি ঘটেছে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট। অখণ্ড ভারতের অখণ্ড বাংলার জাতীয় চেতনাই ছিল নজরুলের জাতীয়তাবোধের মূল কেন্দ্রবিন্দু, তাই স্বাভাবিকভাবেই নজরুলের জাতীয়তাবাদ ছিল অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ (হোসেন ১৯৮৬: ৭৮)।

৩

সত্য বটে, ১৯২৯ সালেও একবার বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ—'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের উদ্যোগে—অখণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলার রাজধানী শহর কলিকাতায় জনাকীর্ণ জনসভা ডাকিয়া কাজী নজরুল ইসলামকে 'জাতীয় কবি' উপাধি দিয়াছিলেন। তাই বলিতে দোষ নাই, জাতীয় কবি উপাধিটির সহিত নজরুলের বিলক্ষণ পূর্ব-পরিচয় ছিল। শুদ্ধ প্রশ্ন করিতে হয়, এই 'জাতীয় কবি' আর সেই 'জাতীয় কবি'র মধ্যে মিল কতটুকু? 'ভাবের ঘরে চুরি' কথাটা এখানে সত্য সত্যই সার্থক হইয়াছে।

নজরুল ইসলামকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবি ঘোষণার কাহিনীটা আহমদ ছফাও খানিক বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:

> বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মরহুম শেখ মুজিবর রহমান কাজী নজরুল ইসলামকে কলকাতার সি. আই. টি. রোডের আড়াই কক্ষের ফ্ল্যাট থেকে ঢাকা নিয়ে এসে ধানমন্ডির একটি আলোবাতাসযুক্ত খোলামেলা বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করলেন। শেখ সাহেবের সপরিবারে নিহত হওয়ার পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁকে বঙ্গভবনে মাথায় কিস্তিটুপি পরিয়ে গলায় মেডেল-ফেডেল কি সব দুলিয়ে দিয়ে মুসলমান বানিয়ে ছাড়লেন। কবির দুর্ভাগ্য, ছিয়াত্তর বছর বয়সে সজ্ঞানে ইসলাম ধর্মটি তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। তখন তো নজরুল ইসলাম সার্কাসের অবলা জন্তু হয়ে উঠেছেন। তাঁকে দিয়ে খেলা দেখাতে বাধা কোথায়? এত অত্যাচার বুড়ো হাড়ে সইবে কেন! একদিন তিনি মারাই গেলেন (ছফা ১৯৮৮)।

আহমদ ছফা যোগ করিয়াছেন, 'আমরা তাঁর মরদেহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে দাফন করলাম। নজরুল ঈমানদার বান্দা ছিলেন, তাঁর ঈমানের তেজ এত প্রখর ছিল যে তা তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকা শরীর নিয়ে জিয়া সাহেবের হাতে বয়েত হয়ে—মাথায় কিস্তিটুপি পরে—ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। এইভাবে কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকার মাটিতে দেহরক্ষা করে নিজেকে পাক্কা মুসলমান প্রমাণ করলেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে চিহ্নিত হলেন' (ছফা ১৯৮৮)।

আহমদ ছফার ভাষা হইতেই ভাবটা খানিক নির্ণয় করা যায়। তাঁহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতে, বাংলাদেশে—বিশেষ জিয়াউর রহমানের জমানায়—যাহা করা হইল তাহা এক ধরনের অনধিকারচর্চা। ছফা বলিয়াছেন, 'কবি নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি হিসেবে চিহ্নিত করে আমরা কবির মান বৃদ্ধি করলাম, নাকি জাতিকেই সম্মানিত করলাম—সে বিচার করার সময় এখনও আসেনি' (ছফা ১৯৮৮)। এই কথাটি ইংরেজি ১৯৮৮ সালের।

আহমদ ছফার এই উষ্মার কারণ পরিষ্কার। তিনি মনে করেন 'জাতীয় কবি' উপাধির আড়ালে খোদ নজরুল ইসলামের জীবনব্যাপী সাধনাকেই প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হইয়াছে। আহমদ ছফার কথা আহমদ ছফার জবানিতেই শোনা ভাল:

> আমরা আমাদের মাটিতে তাঁকে দাফন করেছি। আর মাটিচাপা দিয়েছি নজরুলের সত্যিকার শিল্পীসত্তাকে। জীবনের অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশে চৈতন্যহীন কবিকে বড়সড় একটা বাড়িতে থাকতে দিয়ে আজ আমরা মৃত নজরুলের কাছ থেকে যে মূল্য আদায় করতে চাই তার কাছে শাইলকের আধ পাউন্ড মাংসের দাবিকেও তুচ্ছ বলে মনে হয়। আমরা তাঁকে বৃহত্তর বাঙালীর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে টেনে এনে সাম্প্রদায়িক ফ্রেমে আটকাতে চাইছি। তাঁর বৃহত্তর পরিচয় ঢেকে রেখে ক্ষুদ্রতর পরিচয়টা জাহির করতে চেষ্টা করছি। সভাসমিতিতে শোভন জবানে আমরা যা বলি, তার চাইতে যা বলিনে তাই যেন এতদিনে মুখ্য হয়ে উঠছে (ছফা ১৯৮৮)।

আহমদ ছফার এই বিচারের সহিত বিস্ময়কর সামঞ্জস্য দেখা যায় আরেকটি বিচারের। 'বাংলার কথা' নামক বইয়ের এক জায়গায় সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন লিখিয়াছেন:

> এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে নজরুল কোন দিন ধর্মভিত্তিক বিভাজ্য জাতীয়তায় বিশ্বাস করেন নি এবং ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার তিনি পূর্বাপর বিরোধী ছিলেন। এই একই কারণে চল্লিশ দশকের প্রারম্ভে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে পৃথক মুসলিম আবাসভূমি পাকিস্তান গঠনের রাজনৈতিক প্রস্তাবনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন উপস্থাপিত হয় ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে, সে দিন তার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছিলেন নজরুল। ১৯৪১-৪২ সনে শেরে বাংলা ফজলুল হক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা পত্রিকা নবযুগে স্বনামে লিখিত বিভিন্ন সম্পাদকীয়ের মারফত সে সময় নজরুল তাঁর বক্তব্যকে উপস্থিত করেছিলেন (হোসেন ১৯৮৬: ৭৯)।

সৈয়দ সাহেব আরো লিখিয়াছেন:

যে ঐতিহাসিক সময়ে ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলায় নজরুল সজ্ঞানে জীবিত ছিলেন সেই সময়ের সমসাময়িক জাতীয় চেতনা ও বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় চেতনা রূপগত ও গুণগতভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক কারণে নজরুলকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে চিহ্নিত করা এবং সেই অধিক্ষেত্রে তাঁকে সীমিত করা এক বিরাট ঐতিহাসিক ভ্রম হবে (হোসেন ১৯৮৬: ৭৯-৮০)।

AMARBOI.COM

আহমদ ছফা ইহার অধিক বলিয়াছেন। সেকালের বাঙালি মুসলমান সমাজের গর্হিত সংকীর্ণতাদোষ হইতে নজরুল ইসলাম পুরাপুরি মুক্ত ছিলেন। তাঁহাকে আবার সেই সংকীর্ণ খোপে বন্ধ করার চেষ্টাও তাই অধিক গর্হিত। আহমদ ছফা লিখিয়াছেন:

রক্ষণশীল বাঙালী মুসলমান সমাজ যতদিন পর্যন্ত তাদের প্রচারের ঢাকের কাঠি হিসেবে ব্যবহার করা না যায় ততদিন নজরুল প্রতিভার বিশেষ আদর সমাদর করেনি। তৎকালীন প্রতিনিধিত্বশীল মুসলিম ব্যক্তিত্বের বেশির ভাগই বিরোধিতার এমন একটি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে নজরুলের জীবন ফাঁদে পড়া পশুর মত হয়ে পড়েছিল (ছফা ১৯৮৮)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ইসলাম মুসলমান সমাজের দৈন্য দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়েন নাই। আহমদ ছফা বলিয়াছেন, 'সত্য বটে ইসলাম ধর্মের "সাম্য", "মৈত্রী" এবং "সৌভ্রাতৃত্ববোধ" এ সকল প্রতীতীর প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। মুসলমানদের অধঃপতিত দশা দেখে তিনি দুঃখ পেতেন এবং প্রাণের গভীর থেকে তাদের মধ্যে একটা উত্থান কামনা করতেন।'

ইহার অর্থ এই নয় যে তিনি হিন্দু কিংবা অন্য কোন মুসলমানেতর সম্প্রদায়কে ছোট করিয়া দেখিবার পক্ষে ছিলেন। ছফার কথায়, 'সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কখনও তাঁর ধ্যানদৃষ্টিকে কলুষিত করতে পারেনি। নজরুল ইসলামের জীবন, তাঁর কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত সাম্প্রদায়িক সম্মিলনের সেতুবন্ধন। স্বভাবে চরিত্রে জীবনে আচরণে এই কথাটিকে নজরুলের চাইতে বেশি সত্য প্রমাণ কে করতে পেরেছে' (ছফা ১৯৮৮)?

জীবনের শেষ অভিভাষণে নজরুল ইসলাম ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন: 'হিন্দু-মুসলমানে দিন-রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব—অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপের মত জমা হয়ে আছে—এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম' (ইসলাম ১৯৮৪: ১৯৯)।

সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেনের কথায়ও আহমদ ছফার প্রতিধ্বনি আছে। তিনি লিখিয়াছেন, 'নজরুলের এই অবিভাজ্য সর্বজনীন রূপকে কোন কৃত্রিম বিষুবরেখার মারফত বিভাজ্য করার কোন অবকাশ [নেই]। অতীতে পাকিস্তানী আমলে নজরুলের সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রচেষ্টা এবং অধুনা বাংলাদেশে নজরুলকে জাতীয়করণের বেড়াজালে নিক্ষিপ্ত করার প্রয়াস সমভাবে দুষ্ট ও দোষণীয়,' কারণ, 'নজরুলের যে উদার সর্বজনীন মানবিক ভাবমূর্তি ও চিন্তাধারা তা কোন আংশিক বিকাশ ও আংশিক বিনাশের সুযোগ রাখে না' (হোসেন ১৯৮৬: ৭৯)।

এই অবস্থায় আমরাও আরেক প্রস্ত নৈতিক সংকটের মুখোমুখি হইতেছি। ১৯৪২ সালের পর হইতে ১৯৭৬ পর্যন্ত নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যত সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহার কোনটার দায়ই তাঁহার ঘাড়ে চাপান যায় না। এই দায় আমাদেরই লইতে হইবে। কোন সংজ্ঞাহীন আত্মবিস্মৃত মানবসন্তানকে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা কতখানি শ্রেয়োনীতিসম্মত সে প্রশ্নও তুলিতে হইবে। সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন সত্য কথাই বলিয়াছেন:

> একজন কবির জীবদ্দশায় তাঁর মৌলিক ভাবমূর্তির বিনষ্টিসাধন ও চিন্তাধারার পরিবর্তন করার প্রয়াস শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতার অবকাশে, এর তুলনা অন্য কোন দেশের ইতিহাসে ঘটেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সীমাহীন নির্বুদ্ধিতার জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে লজ্জা ও ক্ষোভের সঞ্চার হতে বাধ্য, যদিও বর্তমানে আমরা এই নির্বুদ্ধিতার সামনে সম্পূর্ণ নিরুপায় দর্শক মাত্র (হোসেন ১৯৮৬: ৮০)।

কে জানে আমাদের এই 'নিরুপায় দর্শক'-দশার শেষ হইবে কখন? আদৌ হইবে কি কোনদিন?

জুন ২০১৫

AMARBOI.COM

দোহাই

১ আবুল মনসুর আহমদ, 'জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত: নজরুল ইসলাম,' আবদুল কাদির সম্পাদিত, *নজরুল-পরিচিতি*, ৩য় মুদ্রণ (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স্, ১৯৬২), পৃ. ১১১-১৬।

২ ফররুখ আহমদ, *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬)।

৩ কাজী নজরুল ইসলাম, 'জাতের বজ্জাতি,' *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১ম খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৬), পৃ. ৮৯-৯১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪ _____ 'যদি আর বাঁশী না বাজে,' *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ৫ম খণ্ড, ২য় অর্ধ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ১৯৬-২০০।

৫ জসীম উদ্‌দীন, 'গোলাম মোস্তফার কবিতা,' মুনশী আবদুল মাননান সম্পাদিত, *কবি গোলাম মোস্তফা: স্মৃতি ও অবদান* (ঢাকা: বিশ্ব পরিচয়, ২০০৩), পৃ. ১০৮-২৪।

৬ আহমদ ছফা, 'নজরুল জন্মজয়ন্তী—ফলহীন প্রতর্ক: কতিপয় জিজ্ঞাসা,' *উত্তরণ*, ২৭ মে-৩ জুন ১৯৮৮।

৭ গোলাম মোস্তফা, *প্রবন্ধ-সংকলন*, মাহফুজা খাতুন সম্পাদিত (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৮)।

৮ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, 'সমিতির সভাপতির আহ্বান,' ১৯৪৩ সালে ঢাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত, সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত, *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮), পৃ. ১০৩-১১।

৯ সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, 'নজরুল প্রসঙ্গ,' *বাংলার কথা* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৬), পৃ. ৭৭-৮০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবর্ধনা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির অভিভাষণ

এই পরিষদে[১] কবির অভ্যর্থনা পূর্বেই হয়ে গেছে। সেই কবি বৈদেহিক; সে বাণীমূর্তিতে ভাবরূপে সম্পূর্ণ। দেহের মধ্যে তার প্রকাশ সংকীর্ণ এবং নানা অপ্রাসঙ্গিক উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত।

আমার বন্ধু[২] এইমাত্র যমের সঙ্গে কবির তুলনা ক'রে বলেছেন, যমরাজ আর কবিরাজ দুটি বিপরীত পদার্থ। বোধ হয় তিনি বলতে চান, যমরাজ নাশ করে আর কবিরাজ সৃষ্টি করে। কিন্তু, এরা উভয়েই যে এক দলের লোক, একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত, সে কথা অমনি ক'রে চাপা দিলে চলবে কেন।

নাটকসৃষ্টির সর্বপ্রধান অংশ তার পঞ্চম অঙ্কে। নাটকের মধ্যে যা-কিছু চঞ্চল তা ঝ'রে প'ড়ে গিয়ে তার যেটুকু স্থায়ী সেইটুকুই পঞ্চম অঙ্কের চরম তিরস্করণীর ভিতর দিয়ে হৃদয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। বিশ্বনাট্যসৃষ্টিতেও পঞ্চম অঙ্কের প্রাধান্য ঋষিরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন—সেইজন্য সৃষ্টিলীলায় অগ্নি, সূর্য, বৃষ্টিধারা, বায়ুর নাট্যনৈপুণ্য স্বীকার ক'রে সব শেষে বলেছেন, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ইনি না থাকলে যা-কিছু ক্ষণকালের তাই জমে উঠে যেটি চিরকালের তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। যেটা স্থূল, যেটা স্থাবর, সেটাকে ঠেলে ফেলবার কাজে মৃত্যু নিয়ত ধাবমান।

---

১ প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদ।

২ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

এই যদি হয় যমরাজের কাজ, তবে কবির কাজের সঙ্গে এর মিল আছে বৈকি। ক্ষণকালের তুচ্ছতা থেকে, জীর্ণতা থেকে, নিত্যকালের আনন্দরূপকে আবরণমুক্ত ক'রে দেখাবার ভার কবির। সংসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অঙ্কে নানাপ্রকার কাজের লোক নানাপ্রকার প্রয়োজনসাধনে প্রবেশ করেন; কিন্তু কবি আসেন 'পঞ্চমঃ'; আশুপ্রয়োজনের সদ্যঃপাতী আয়োজনের যবনিকা সরিয়ে ফেলে অহৈতুকের রসস্বরূপকে বিশুদ্ধ ক'রে দেখাতে।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণে গন্ধে, রূপে সংগীতে নৃত্যে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে। কবির কাব্যেও সেই বাণীরই ধারা। যে চিত্তযন্ত্রের ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত, তার প্রকৃতি-অনুসারে এই প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। এই বিশেষত্বই অসীমকে বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে আপন ক'রে নিয়ে তার রস পাই। এই আপন ক'রে নেওয়াটি ব্যক্তিভেদে কিছু-না-কিছু ভিন্নতা পায়। তাই একই কাব্য কত লোকে আপন মনে কত রকম ক'রে বুঝেছে। সেই বোঝার সম্পূর্ণতা কোথাও বেশি, কোথাও কম, কোথাও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কোথাও অশুদ্ধ। প্রকাশের উৎকর্ষেও যেমন তারতম্য, উপলব্ধির স্পষ্টতাতেও তেমনি। এইজন্যেই কাব্য বোঝবার আনন্দেরও সাধনা করতে হয়।

এই বোঝবার কাজে কেউ কেউ কবির সাহায্য চেয়ে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে, যে-কবি কাব্য লেখেন তিনি এক মানুষ, আর যিনি ব্যাখ্যা করেন তিনি আর-এক জন। এই ব্যাখ্যাকর্তা পাঠকদেরই সমশ্রেণীয়। তাঁর মুখে ভুল ব্যাখ্যা অসম্ভব নয়।

আমার কাব্য ঠিক কী কথাটি বলছে, সেটি শোনবার জন্যে আমাকে বাইরে যেতে হবে—যাঁরা শুনতে পেয়েছেন তাঁদের কাছে। সম্পূর্ণ ক'রে শোনবার ক্ষমতা সকলের নেই। যেমন অনেক মানুষ আছে যাদের গানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান থাকে না—তাদের কানে সুরগুলো পৌঁছয়, গান পৌঁছয় না, অর্থাৎ সুরগুলির অবিচ্ছিন্ন ঐক্যটি তারা স্বভাবত ধরতে পারে না। কাব্য সম্বন্ধে সেই ঐক্যবোধের অভাব অনেকেরই আছে। তারা যে একেবারেই কিছু পায় না তা নয়—সন্দেশের মধ্যে তারা খাদ্যকে পায়, সন্দেশকেই পায় না। সন্দেশ চিনি-ছানার চেয়ে অনেক বেশি, তার মধ্যে স্বাদের যে-সমগ্রতা আছে সেটি পাবার জন্যে রসবোধের শক্তি থাকা চাই। বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা, চর্চার দ্বারা এই সমগ্রতার অনির্বচনীয় রসবোধের শক্তি পরিণতি লাভ করে। যে-ব্যক্তি সেরা যাচনদার এক দিকে তার স্বাভাবিক সূক্ষ্ম অনুভূতি, আর-এক দিকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা, দুয়েরই প্রয়োজন।

এই কারণেই এই-যে পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার সার্থকতা আছে। এখানে কয়েকজন যে একত্র হয়েছেন তার একটিমাত্র কারণ, কাব্য থেকে তাঁরা কিছু-না-কিছু শুনতে পেয়েছেন, তাঁরা উদাসীন নন। এই পরস্পরের শোনা নানা দিক থেকে মিলিয়ে নেবার আনন্দ আছে। আর, যাঁরা স্বভাবশ্রোতা, যাঁরা সম্পূর্ণকে সহজে উপলব্ধি করেন, তাঁরা এই পরিষদে আপন যোগ্য আসনটি লাভ করতে পারবেন।

এই পরিষদটি যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। কবির পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো সুযোগ, পাঠকের শ্রদ্ধা। যুক্তিসিদ্ধ বিষয়ের প্রধান সহায় প্রমাণ, রসসৃষ্টি-পদার্থের প্রধান সহায় শ্রদ্ধা। সুন্দরকে দেখবার পক্ষে অশ্রদ্ধার মতো অন্ধতা আর নেই। এই বিশ্বরচনায় সুন্দরের ধৈর্য অপরিসীম। চিত্তে যখন উপেক্ষা, শ্রদ্ধা যখন অসাড়, তখনো প্রভাতে সন্ধ্যায় ঋতুতে ঋতুতে সুন্দর আসেন, কোনো অর্ঘ্য না নিয়ে চলে যান, তাঁকে যে গ্রহণ করতে না পারলে সে জানতেও পারে না যে সে বঞ্চিত। যুগে যুগে মানুষের সৃষ্টিতেও এমন ঘটনা ঘটেছে, অশ্রদ্ধার অন্ধকার রাত্রে সুন্দর অলক্ষ্যে এসেছেন, দীপ জ্বালা হয় নি, অলক্ষ্যে চলে গিয়েছেন। সাহিত্যে ও কলারচনায় আজ আমাদের যে সঞ্চয় তা যুগ-যুগান্তরের বহু অপচয়ের পরিশিষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। অনেক অতিথি ফিরে যায় রুদ্ধদ্বারে বৃথা আঘাত ক'রে, কেউ-বা দৈবক্রমে এসে পড়ে যখন গৃহস্থ জেগে আছে। কেউ-বা অনেক দ্বার থেকে ফিরে গিয়ে হঠাৎ দেখে একটা গৃহের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বার খোলা। আমার সৌভাগ্য এই যে, এখানে দ্বার খোলা পেয়েছি, আহ্বান শুনতে পাচ্ছি 'এসো'। এই পরিষদ আমাকে শ্রদ্ধার আসন দেবার জন্যে প্রস্তুত; স্বদেশের আতিথ্য এইখানে অকৃপণ; এই সভার সভ্যদের কাছে আমার পরিচয় অন্তত ঔদাসীন্যের দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে না।

দেশবিদেশে আমার সম্মানের বিবরণ আমার বন্ধু এইমাত্র বর্ণনা করেছেন। বাইরের দিক থেকে বিদেশের কাছে আমার পরিচয় পরিমাণ-হিসাবে অতি অল্প। আমার লেখার সামান্য এক অংশের তর্‌জমা তাঁদের কাছে পৌঁচেছে, সে তর্‌জমারও অনেকখানি যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। কিন্তু সাহিত্যে, কলারচনায়, পরিমাণের হিসাবটা বড়ো হিসাব নয়, সে ক্ষেত্রে অল্প হয়তো বেশির চেয়ে বেশি হতেও পারে। সাহিত্যকে ঠিক ভাবে যে দেখে সে মেপে দেখে না, তলিয়ে দেখে; লম্বা পাড়ি দিয়ে সাঁতার না কাটলেও তার চলে, সে ডুব দিয়ে পরিচয় পায়, সেই পরিচয় অন্তরতর। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ঐতিহাসিক তথ্যের জন্যে পরিমাণের দরকার, স্বাদের বিচারের জন্যে এক গ্রাসের মূল্য দুই গ্রাসের চেয়ে কম নয়। বস্তুত এই ক্ষেত্রে অধিক অনেক সময়ে স্বল্পের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়; অনেককে দেখতে গিয়ে যে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে তাতে এককে দেখবার বাধা ঘটায়। রসসাহিত্যে এই এককে দেখাই আসল দেখা।

একজন য়ুরোপীয় আর্টিস্টকে একদিন বলেছিলুম যে, ইচ্ছা করে ছবি আঁকার চর্চা করি, কিন্তু আমার দৃষ্টি ক্ষীণ ব'লে চেষ্টা করতে সাহস হয় না। তিনি বললেন, 'ও ভয়টা কিছুই নয়, ছবি আঁকতে গেলে চোখে একটু কম দেখাই দরকার; পাছে অতিরিক্ত দেখে ফেলি এই আশঙ্কায় চোখের পাতা ইচ্ছে ক'রেই কিছু নামিয়ে দিতে হয়। ছবির কাজ হচ্ছে সার্থক দেখা দেখানো; যারা নিরর্থক অধিক দেখে তারা বস্তু দেখে বেশি, ছবি দেখে কম।'

দেশের লোক কাছের লোক—তাঁদের সম্বন্ধে আমার ভয়ের কথাটা এই যে, তাঁরা আমাকে অনেকখানি দেখে থাকেন, সমগ্রকে সার্থককে দেখা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আমার নানা মত আছে, নানা কর্ম আছে, সংসারে নানা লোকের সঙ্গে আমার নানা সম্বন্ধ আছে; কাছের মানুষের কোনো দাবি আমি রক্ষা করি, কোনো দাবি আমি রক্ষা করতে অক্ষম;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ-বা আমার কাছ থেকে তাঁদের কাজের ভাবের চিন্তার সম্মতি বা সমর্থন পান কেউ-বা পান না, এই-সমস্তকে জড়িয়ে আমার পরিচয় তাঁদের কাছে নানাখানা হয়ে ওঠে—নানা লোকের ব্যক্তিগত রুচি, অনভিরুচি ও রাগদ্বেষের ধূলি-নিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান। যে-দূরত্ব দৃশ্যতার অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টিবিষয়ের সত্যকে স্পষ্ট ক'রে তোলে, দেশের লোকের চোখের সামনে সেই দূরত্ব দুর্লভ। মুক্তকালের আকাশের মধ্যে সঞ্চরণশীল যে-সত্যকে দেখা আবশ্যক, নিকটের লোক সেই সত্যকে প্রায়ই একান্ত বর্তমান কালের আলপিন দিয়ে রুদ্ধ ক'রে ধরে; তার পাখার পরিধির পরিমাণ দেখে, কিন্তু ওড়ার মধ্যে সেই পাখার সম্পূর্ণ ও যথার্থ পরিচয় দেখে না। এইরকম দেশের লোকের অতি নিকট দৃষ্টির কাছে নিজের যে খর্বতা তা আমি অনেককাল থেকে অনুভব ক'রে এসেছি। দেশের লোকের সভায় এরই সংকোচ আমি এড়াতে পারি নে। অন্যত্র জগদ্‌বরেণ্য লোকদের সামনে আমাকে কথা বলতে হয়েছে, কিছুমাত্র দ্বিধা আমার মনে কোনোদিন আসে নি; নিশ্চয় জেনেছি, তাঁরা আমাকে স্পষ্ট ক'রে বুঝবেন, একটি নির্মল ও প্রশস্ত ভূমিকার মধ্যে আমার কথাগুলিকে তাঁরা ধ'রে দেখতে পারবেন। এ দেশে, এমন-কি, অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সামনেও দাঁড়াতে আমার সংকোচ বোধ হয়—জানি যে, কত কী ঘরাও কারণে ও ঘর-গড়া অসত্যের ভিতর দিয়ে আমার সম্বন্ধে তাঁদের বিচারের আদর্শ উদার হওয়া সম্ভবপর হয় না।

এইজন্যেই যমরাজের নিন্দার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছি; কারণ, তাঁর উপরে আমার মস্ত ভরসা। তিনি নৈকট্যের অন্তরাল ঘুচিয়ে দেবেন; আমার মধ্যে যা-কিছু অবান্তর নিরর্থক ক্ষণকালীন, আর আমার সম্বন্ধে যা-কিছু মিথ্যা সৃষ্টি, সে-সমস্তই তিনি এক অন্তিম নিশ্বাসে উড়িয়ে দেবেন। বাহিরের নৈকট্যকে সরিয়ে ফেলে অন্তরের নৈকট্যকে তিনি সুগম করবেন। কবিরাজদের পরম সুহৃদ যমরাজ। যেদিন তিনি আমাকে তাঁর দরবারে ডেকে নেবেন সেদিন তোমাদের এই রবীন্দ্র-পরিষদ খুব জমে উঠবে।

কিন্তু, এ কথা ব'লে বিশেষ কোনো সান্ত্বনা নেই। মানুষ মানুষের নগদ প্রীতি চায়। মৃত্যুর পরে স্মরণসভার সভাপতির গদ্‌গদ ভাষার করুণ রস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে উচ্ছ্বসিত, সেখানে তৃষার্তের পাত্র পৌঁছয় না। যে জীবলোকে এসেছি এখানে নানা রসের উৎস আছে, সেই সুধারসে মর্তলোকেই আমরা অমৃতের স্বাদ পাই; বুঝতে পারি, এই মাটির পৃথিবীতেও অমরাবতী আছে। মানুষের কাছে মানুষের প্রীতি তারই মধ্যে একটি প্রধান অমৃতরস—মরবার পূর্বে এ যদি অঞ্জলি ভরে পান করতে পাই তা হলে মৃত্যু অপ্রমাণ হয়ে যায়। অনেকদিনের কথা বলছি; তখন আমার অল্প বয়স। একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুশয্যার পাশে আমি বসে আছি। তিনি বললেন, 'রবি, তোমার হাতটা আমাকে দাও দেখি।' হাত বাড়িয়ে দিলেম, কিন্তু তাঁর এই অনুরোধের ঠিক মানেটি বুঝতে পারলেম না। অবশেষে তিনি আমার হাত ধ'রে বললেন, 'আমি এই যে জীবলোক থেকে বিদায় নিচ্ছি, তেমার হাতের স্পর্শে তারই শেষস্পর্শ নিয়ে যেতে চাই।'

সেই জীবলোকের স্পর্শের জন্যে মনে আকাঙ্ক্ষা থাকে। কেননা, চলে যেতে হবে। আমার কাছে সেই স্পর্শটি কোথায় স্পষ্ট, কোথায় নিবিড়। যেখান থেকে এই কথাটি আসছে, 'তুমি আমাকে খুশি করেছ, তুমি যে জন্মেছ সেটা আমার কাছে সার্থক, তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার মূল্য আমি মানি।' বর্তমানের এই বাণীর মধ্যে ভাবীকালের দানও প্রচ্ছন্ন; যে-প্রীতি, যে-শ্রদ্ধা সত্য ও গভীর, সকল কালের সীমা সে অতিক্রম করে; ক্ষণকালের মধ্যে সে চিরকালের সম্পদ দেয়। আমার বিদায়কাল অধিক দূরে নেই; এই সময়ে জীবলোকের আনন্দস্পর্শ তোমাদের এই পরিষদে আমার জন্য তোমরা প্রস্তুত রেখেছ, তোমাদের যা দেয় ভাবীকালের উপরে তার বরাত দাও নি।

ভাবীকালকে অত্যন্ত বেশি ক'রে জুড়ে বসে থাকব, এমন আশাও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই। ভবিষ্যতের কবি ভবিষ্যতের আসন সগৌরবে গ্রহণ করবে। আমাদের কাজ তাদেরই স্থান প্রশস্ত ক'রে দেওয়া। মেয়াদ ফুরোলে যে-গাছ মরে যায় অনেকদিন থেকে ঝরা পাতায় সে মাটি তৈরি করে; সেই মাটিতে খাদ্য জমে থাকে পরবর্তী গাছের জন্যে। ভবিষ্যতের সাহিত্যে আমার জন্যে যদি জায়গার টানাটানিও হয় তবু এ কথা সবাইকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানতে হবে যে, সাহিত্যের মাটির মধ্যে গোচরে অগোচরে প্রাণের বস্তু কিছু রেখে গেছি। নতুন প্রাণ নতুন রূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু পুরাতনের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে প্রাণশক্তি পায় না; আমাদের বাণীর সপ্তকে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে তবেই ভবিষ্যতের বাণী উপরের সপ্তকে চড়তে পারে। সে সপ্তকের রাগিণী তখন নূতন হবে, কিন্তু পুরাতনকে অশ্রদ্ধা করবার স্পর্ধা যেন তার না হয়। মনে যেন থাকে, তখনকার কালের পুরাতন এখনকার কালে নূতনের গৌরবেই আবির্ভূত হয়েছিল।

নবযুগ একটা কথা মাঝে মাঝে ভুলে যায়—তার বুঝতে সময় লাগে যে, নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত। মহারাজা-বাহাদুর আকাশে যে-জয়ধ্বজা ওড়ান আজ সে নতুন, কাল সে পুরানো। কিন্তু সূর্যের রথে যে অরুণধ্বজা ওড়ে কোটি কোটি যুগ ধ'রে প্রতিদিনই সে নবীন। একটি বালিকা তার স্বাক্ষরখাতায় আমার কাছ থেকে একটি বাংলা শ্লোক চেয়েছিল। আমি লিখে দিয়েছিলুম—

নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্তমান সেই তো নবীন।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে নূতনের সুরা,
নবীনের নিত্যসুধা তৃপ্তি করে পুরা।

সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনই মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোনো একজন বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন 'রক্ত' শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তা হলে বুঝব, সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না ব'লেই তাক লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যে এইরকম নতুন হয়ে ওঠবার জন্যে যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের তরুণ ব'লে ঘোষণা করেন। কিন্তু, আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাঁদের উষাকে নিয়ুমার্কেটে 'খুন' ফরমাশ করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক। আর যে-বৃদ্ধদের মরচে-ধরা চিত্তবীণায় পুরাতনের স্পর্শে নবীন রাগিণী বেজে ওঠে না তাঁদের সঙ্গে আমার মিল হবে না, তাঁদের বয়স নিতান্ত কাঁচা হলেও।

এই পরিষদ সকল বয়সের সেই তরুণদের পরিষদ হোক। পুরাতনের নবীনতা বুঝতে তাঁদের যেন কোনো বাধা না থাকে।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ / ফাল্গুন ১৩৩৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী নজরুল ইসলাম

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ

তখন আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজ-কয়েদী। অপরাধ, ছেলে খাওয়ার ঘটা দেখে রাজার মাকে একদিন রাগের চোটে ডাইনী ব'লে ফেলেছিলাম।...

এরি মধ্যে একদিন এসিস্ট্যান্ট জেলার এসে খবর দিলেন, 'আবার কি মশাই, আপনি ত নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলেন, আপনাকে রবিঠাকুর তাঁর "বসন্ত" নাটক উৎসর্গ করেছেন।'

আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন আরো দু'একটি কাব্য-বাতিকগ্রস্ত রাজ-কয়েদী। আমার চেয়েও বেশী হেসেছিলেন সেদিন তাঁরা। আনন্দে নয়, যা নয় তাই শুনে।

কিন্তু ঐ আজগুবি গল্পও সত্য হ'য়ে গেল। বিশ্বকবি সত্যিসত্যিই আমার ললাটে 'অলক্ষণের তিলক-রেখা' এঁকে দিলেন।

অলক্ষণের তিলক-রেখাই বটে! কারণ, এর পর থেকে আমার অতি অন্তরঙ্গ রাজবন্দী বন্ধুরাও আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। যাঁরা এতদিন আমার এক লেখাকে দশবার ক'রে প্রশংসা করেছেন, তাঁরাই পরে সেই লেখার পনেরবার ক'রে নিন্দা করলেন। আমার হ'য়ে গেল 'বরে শাপ!'

জেলের ভিতর থেকেই শুনতে পেলাম, বাইরেও একটা বিপুল ঈর্ষা-সিন্ধু ফেনায়িত হ'য়ে উঠেছে। বিশ্বাস হ'ল না। বিশেষ ক'রে যখন শুনলাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারই অগ্রজ-প্রতিম কোনো কবি-বন্ধু সেই সিন্ধু-মন্থনের অসুর-পক্ষ 'লীড্' করছেন। আমার প্রতি তাঁর অফুরন্ত স্নেহ, অপরিসীম ভালবাসার কথা শুধু যে আমরা দু'জনেই জানতাম, তা নয়, দেশের সকলেই জানত তাঁর গদ্যে-পদ্যে কীর্তিত আমার মহিমা-গানের ঘটা দেখে।

সত্য-সুন্দরের পূজারী ব'লে যাঁরা হেঁইয়ো হেঁইয়ো ক'রে বেড়ান, তাঁদের মনও ঈর্ষায় কালো হ'য়ে ওঠে,—শুনলে আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকে না।

এ-খবর শু'নে চোখের জল আমার চোখেই শুকিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম শুধু আমি, বাইরের এই লাভে অন্তরের কত বড় ক্ষতি হ'য়ে গেল আমার! মনের মনে কেঁদে বললাম, 'হায় গুরুদেব! কেন আমার এত বড় ক্ষতিটা করলে?'...

বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা ক'রে এসেছি সকল হৃদয়-মন দিয়ে, যেমন ক'রে ভক্ত তার ইষ্টদেবতাকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোকে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

এমন কি আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্রবিদ্বেষী কোনো একজনের মাথার চাঁদিতে আজো অক্ষয় হ'য়ে লেখা আছে! এবং এই ভক্তির বিচারের ভার একদিন আদালতের ধর্মাধিকরণের ওপরেই পড়েছিল।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় কবি ও কথাশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন কবির সামনেই এ-কথা ফাঁস ক'রে দিলেন। কবি হেসে বললেন, 'যাক, আমার আর ভয় নেই তা'হলে!'

তারপর কতদিন দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে। নিজের লেখা দু'চারটে কবিতা-গানও শুনিয়েছি—অবশ্য কবির অনুরোধেই। এবং আমার অতি সৌভাগ্যবশতঃ তার অতি-প্রশংসা লাভও করেছি কবির কাছ থেকে। সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কোনদিন এতটুকু প্রাণের দৈন্য বা মন-রাখা ভাল বলবার চেষ্টা দেখিনি।

সঙ্কোচে দূরে গিয়ে বসলে সস্নেহে কাছে ডেকে বসিয়েছেন। মনে হয়েছে, আমার পূজা সার্থক হ'ল, আমি বর পেয়ে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকদিন তাঁর কাছে না গেলে নিজে ডেকে পাঠিয়েছেন। কতদিন তাঁর তপোবনে গিয়ে থাকবার কথা বলেছেন। হতভাগা আমি, তাঁর পায়ের তলায় ব'সে মন্ত্র গ্রহণের অবসর ক'রে উঠতে পারলাম না। বনের মোষ তাড়িয়েই দিন গেল।

এই নিয়ে কতদিন তিনি আমায় কতভাবে অনুযোগ করেছেন—'তুমি তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচছ—তোমাকে জন-সাধারণ একেবারে খানায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে'—ইত্যাদি।

আমি দেখেছি, এ-গৌরবে আমার মুখ যত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, কোনো কোনো নাম-করা কবির মুখে কে যেন তত কালি ঢেলে দিয়েছে! ক্রমে ক্রমে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরাই এমনি ক'রে শত্রু হ'য়ে দাঁড়ালেন। আজ তিন চার বছর ধ'রে এই 'শুভানুধ্যায়ী'রা গালি-গালাজ করেছেন আমায়, তবু তাঁদের মনের ঝাল বা প্রাণের খেদ মিটল না। বাপ রে বাপ! মানুষের গা'ল দেবার ভাষা ও তার এত বৈচিত্রতবও থাকতে পারে, এ আমার জানা ছিল না।

ফি শনিবারে চিঠি! এবং তাতে সে কী গাঁড়োয়ানি রসিকতা, আর সে মেছোহাটা থেকে টুকে-আনা গালি! এই গালির গালিচাতে বোধহয় আমি এ-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ্!

বাংলায় 'রেকর্ড' হয়ে রইলো আমায়-দেওয়া এই গালির স্তূপ। কোথায় লাগে ধাপার মাঠ! ফি হপ্তায় মেল (ধাপা-মেল) বোঝাই। কিন্তু এত নিন্দাও সয়েছিল। এতদিন তবু সান্ত্বনা ছিল যে, এ হচ্ছে তন্তুবায়ের বলীবর্দ ক্রয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। বাবা, তুই নখদন্তহীন নিরামিষাশী কবি, তোর কেন এ ঘোড়া-রোগ—এ স্বদেশ-প্রেমের বাই উঠল? কোথায় তুই হাঁ ক'রে খাবি গুল-বদনীর গুলিস্তানে মলয়-হাওয়া, দেখবি ফুলের হাই-তোলা, গাইবি, 'আয়লো অলি কুসুম-কলি' গান,—তা না ক'রে দিতে গেলি রাজার পেছনে খোঁচা! গেলি জেলে, টান্‌লি ঘানি, করলি প্রায়োপবেশন, পরলি শিকল—বেড়ী, ডাণ্ডাবেড়ী, বইগুলোকে একধার থেকে করাতে লাগলি বাজেয়াপ্ত, এ কোন্ রকম রসিকতা তোর? কেনই বা এ হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুৎ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ একদিন দেখি ঝড় উঠেছে! সাহিত্যের বেণু-বনে। এবং দেখতে দেখতে সুরের বাঁশী অসুরের কোঁৎকা হ'য়ে উঠেছে! ছুট্ ছুট্! যত মোলায়েম ক'রেই বেণু-বন বলি না কেন, তাতে ঝড় উঠলে যে তা চিরন্তন বাঁশ-বনই হ'য়ে ওঠে তা কোন্ পাষণ্ড অবিশ্বাস করবে?

বেচারী তরুণ সাহিত্য! যেন বালক অভিমন্যুকে মারতে সপ্তমহারথীর সমাবেশ! বাইরে ছেলেমেয়ের ভিড় জ'মে গেল। ঘন ঘন হাততালি! বলে, 'এই! বাঁশ-বাজি দেখতে যাবি, দৌড়ে আয়!' কিন্তু শুধুই কি সপ্তমহারথীর মার? তাঁদের পেছনের পদাতিকগুলি যে আরো ভীষণ। ধুলো-কাদা-গোবর-মাটি—কোনো রুচির বাচ-বিচার নাই, বেপরোয়া ছুঁড়ে চলেছে!

মহারথীদের মারে অমর্যাদা নেই, কিন্তু বাইরে থেকে আসা ঐ ভাড়াটে গুণ্ডাগুলোর নোংরামিতে সাহিত্যের বেণু-বন যে পুকুর-পাড়ের বাঁশবাগান হ'য়ে উঠল।

পুলিশের জুলুম আমার গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। ওদের জুলুমের তবু একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জুলুম করতে সুরু করে, তার আর পারাপার নেই। এরা তখন হ'য়ে ওঠে টিক্‌টিকে পুলিশের চেয়েও ক্রূর, অভদ্র। যেন চাক-ভাঙা ভীমরুল। জলে ডুবেও নিষ্কৃতি নেই, সেখানে গিয়েও দংশন করবে।

পলিটিক্সের পাঁকের ভয়ে পালিয়ে গেলাম নাগালের বাইরে। মনে করলাম, যাক, এতদিনে একবার প্রাণ ভ'রে সাহিত্যের নির্মল বায়ু সেবন ক'রে অতীতের গ্লানি কাটিয়ে উঠব। ও বাবা! সাহিত্যের আসর যে পলিটিক্যাল আখড়ার চেয়েও নোংরা, তা কে জানত!

কপাল! কপাল! পালিয়েও কি পার আছে? হঠাৎ একদিন সপ্তরথীর সপ্ত-প্রহরণে চকিত হ'য়ে উঠলাম। ব্যাপার কি?

জানতে পারলাম, আমার অপরাধ আমি তরুণ। তরুণেরা নাকি আমায় ভালবাসে, তা'রা আমার লেখার ভক্ত!

সভয়ে প্রশ্ন করলাম, আজ্ঞে, এতে আমার অপরাধটা কিসের হ'ল?—বহু কণ্ঠের হুঙ্কার উঠলো, ঐটেই তোমার অপরাধ, তুমি তরুণ এবং তরুণেরা তোমায় নিয়ে নাচে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম, আপাততঃ আপনাদের ভয়ে আজই ত বুড়ো হ'য়ে যেতে পারছিনে। ওর জন্য দু'-দশ বছর মার খেয়েই অপেক্ষা করতে হবে! আর, যারা আমায় নিয়ে নাচে, আপনারাও তাদের নাচিয়ে ছেড়ে দিন। গোল চুকে যাবে। আমায় নিয়ে কেন টানাটানি?

আবার নেপথ্যে শোনা গেল,—তুমি এই জ্যাঠা অভিমন্যুর পৃষ্ঠরক্ষী। তোমাকে মারতে পারলেই একে কবুল করতে দেরী লাগবে না।

দেখাই যাক!...

এতদিন আমি উপেক্ষাবশতই এ ধোঁয়া-বাণের প্রত্যুত্তরে ধোঁয়া ছাড়িনি—না উনুনের, না সিগারেটের! ভেবেছিলাম সম্রাটে-সম্রাটে যুদ্ধ, দূরে দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল। কিন্তু হাতিতে-হাতিতে লড়াই হ'লেও নল-খাগড়ার নিস্তার নাই দেখছি। কাজেই, আমাদেরও এবার আত্মরক্ষা করতে হবে। প'ড়ে প'ড়ে মার খাওয়ায় কোনো পৌরুষ নেই।...

পলিটিক্সের পক্ষকে যাঁরা এতদিন ঘৃণা ক'রে এসেছেন, বেণু-বনের বাঁশের প্রতি তাঁদের এই আকস্মিক আসক্তি দেখে আমারই লজ্জা করছে—বাইরের লোক কি বলছে তা না-ই বললাম।

এ-বাঁশ ছোঁড়ারও তারিফ করতে হবে। কোনো বিশেষ একজনের শির লক্ষ্য ক'রে না ছুঁড়ে এঁরা ছুঁড়ছেন একেবারে দল লক্ষ্য ক'রে। কারণ, তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার লজ্জা নেই। বীর বটে! এতদিন তাই পরাস্ত মেনেই চুপ ক'রে ছিলাম। কিন্তু ঐ চুপ ক'রে থাকি ব'লেই ও-পক্ষ মনে করেন, আমরা জিতে গেলাম। তাই এবার মাথা বেছে-বেছেই বাঁশ ছোঁড়া হচ্ছে—বাণ নয়!

অবশ্য, সে-বাঁশে বাঁশীর মত গোটাকতক ফুটো ক'রে সুর ফোটাবার আয়াসেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তবু তার খোঁচা আর স্থূলত্বই বলে, ও বাঁশী নয়—বাঁশ।

বীণাই শোভা পায় যাঁর হাতে, তাঁকেও লাঠি ঘুরাতে দেখলে, দুঃখও হয়, হাসিও পায়। পালোয়ানি মাতামাতিতে কে যে কম যান, তা ত বলা দুষ্কর।...

আজকের 'বাঙ্গলার কথা'য় দেখলাম, যিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের পক্ষ হ'য়ে পঞ্চপাণ্ডবকে লাঞ্ছিত করবার সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের উভয় পক্ষের পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম-সম সেই মহারথী কবিগুরু এই অভিমন্যু-বধে সায় দিয়েছেন। মহাভারতের ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে সায় দেননি, বৃহত্তর ভারতের ভীষ্ম সায় দিয়েছেন—এইটেই এ-যুগের পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক।

এই অভিমন্যুর রক্ষী মনে ক'রে কবিগুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় রক্তকে 'খুন' ব'লে অপরাধ করেছি।

কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি ত নিজেও টুপী-পায়জামা পরেন, অথচ, আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হ'য়ে উঠি কেন, বুঝতে পারিনে।

এই আরবী-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ক'রে গেছেন।

আমি একটা জিনিস কিছুদিন থেকে লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি। সম্ভ্রান্ত হিন্দু-বংশের অনেকেই পায়জামা-শেরওয়ানী-টুপী ব্যবহার করেন, এমন কি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাঁদের কেউ বিদ্রূপ করে না, তাঁদের ড্রেসের নাম হ'য়ে যায় তখন 'ওরিয়েন্টাল'। কিন্তু ওইগুলোই মুসলমানেরা পরলে তা'রা হ'য়ে যায় 'মিয়া সাহেব'! মৌলানা সাহেব আর নারদ মুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা হ'লে কে যে হারবেন বলা মুশকিল; তবু ও নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপের আর অন্ত নেই।

আমি ত টুপী-পায়জামা-শেরওয়ানী-দাড়িকে বর্জন ক'রে চলেছি শুধু ঐ 'মিয়া সাহেব' বিদ্রূপের ভয়েই—তবুও নিস্তার নেই।

এইবার থেকে আদালতকে না হয় বিচারালয় বলব, কিন্তু নাজির-পেশকার-উকিল-মোক্তারকে কী বলব?

কবিগুরুর চিরন্তনের দোহাই নিতান্ত অচল। তিনি ইটালিকে উদ্দেশ্য ক'রে এক কবিতা লিখেছেন। তাতে—'উতারো ঘোমটা' তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি। 'ঘোমটা খোলা' শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। 'উতারো ঘোমটা' আমি লিখলে হয়ত সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীই হতাম। কিন্তু 'উতারো' কথাটা যে জাতেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সঙ্গীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে ও-জায়গাটায়, তা' ত কেউ অস্বীকার করবে না। ঐ একটু ভাল শোনাবার লোভেই ঐ একটি ভিন্-দেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করি। কবিগুরুও কতদিন আলাপ-আলোচনায় এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন।

আজ আমাদেরও মনে হচ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চির-চেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পেছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে।

'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানী বা বলশেভিকী রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও-দু'টোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।

আমি শুধু 'খুন' নয়—বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্ব-কাব্য-লক্ষ্মীর একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে ব'লেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ও-ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা ক'রে গেছেন।

বাংলা কাব্য-লক্ষ্মীকে দুটো ইরানী 'জেওর' পরালে তাঁর জাত যায় না, বরং তাঁকে আরো খুবসুরতই দেখায়।

আজকের কলা-লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই ত মুসলমানী ঢং-এর। বাইরের এ-ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিল্পীই স্বীকার করেন। পণ্ডিত মালবিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন।

তা'ছাড়া যে 'খুনে'র জন্য কবিগুরু রাগ করেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের কথায়, 'কালার-বক্সে' (colour box-এ) এবং তা 'খুন করা', 'খুন হওয়া' ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপারেই নয়। হৃদয়েরও খুন-খারাবী হ'তে দেখি আজো। এবং তা শুধু মুসলমান পাড়া লেনেই হয় না।

আমার একটা গান আছে—

'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই গানটি সেদিন কবিগুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়ত তাঁর ও-কথার উল্লেখ। তিনি রক্তের পক্ষপাতী। অর্থাৎ ও-লাইনটাকে—'উদিবে সে রবি মোদেরই রক্তে রাঙিয়া পুনর্বার'ও করা চল্‌ত। চল্‌ত, কিন্তু ওতে ওর অর্ধেক ফোর্স ক'মে যেত। আমি যেখানে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ঐ রকম ন্যাশন্যাল সঙ্গীতে বা রুদ্ররসের কবিতায়। যেখানে 'রক্তধারা' লিখবার, সেখানে জোর ক'রে 'খুনধারা' লিখি নাই। তাই ব'লে 'রক্ত-খারাবী'ও লিখি নাই, হয় 'রক্তারক্তি' না হয় 'খুন-খারাবী' লিখেছি।

কবিগুরু মনে করেন, রক্তের মানেটা আরো ব্যাপক। ওটা প্রেমের কবিতাতেও চলে। চলে, কিন্তু ওতে 'রাগ' মেশাতে হয়। প্রিয়ার গালে যেমন 'খুন' ফোটে না তেমনি 'রক্ত'ও ফোটে না—নেহাৎ দাঁত না ফুটালে। প্রিয়ার সাথে 'খুনা-খুনী' খেলি না, কিন্তু 'খুন-সুড়ি' হয়ত করি।

কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভু'লে যান যে, বাংলার কাব্য-লক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তাঁরা তাঁদের কাছ থেকে টুপী আর চাপকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গীর সুর শুনতে, ফুল-বনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর।

এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেল যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্য-সভায় ভিড় না ক'রে হিন্দু-সভারই মেম্বার হ'ন গিয়ে।

যে কবিগুরু অভিধান ছাড়া নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি ক'রে ভাবীকালের জন্য আরো তিনটে অভিধানের সঞ্চয় রেখে গেলেন, তাঁর এই নতুন-শব্দ-ভীতি দেখে বিস্মিত হই। মনে হয়, তাঁর এই আক্রোশের পেছনে অনেক কেহ এবং অনেক কিছু আছে। আরো মনে হয়, আমার শত্রু-সাহিত্যিকগণের অনেকদিনের অনেক মিথ্যা অভিযোগ জ'মে জ'মে ওঁর মনকে বিষিয়ে তুলেছে। নৈলে আরবী-ফার্সি শব্দের মোহ ত আমার আজকের নয় এবং কবিগুরুর সাথে আমার বা আমার কবিতার পরিচয়ও আজকের নয়। কই, এতদিন ত কোনো কথা উঠল না এ নিয়ে!

সবচেয়ে দুঃখ হয়, যখন দেখি কতকগুলো জোনাকীপোকা রবিলোকের বহু নিম্নে থেকেও কবিত্বের আস্ফালন করে। ভক্ত কি শুধু ঐ নোংরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকগুলোই, যারা রাত-দিন তাঁর কানের কাছে অন্যের কুৎসা গেয়ে তাঁর শান্ত-সুন্দর মনকে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলছে? আর আমরা তাঁর কাছে ঘন ঘন যাইনে ব'লেই হ'য়ে গেলাম তাঁর শত্রু?

কবিগুরুর কাছে প্রার্থনা, ঐ ধৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব তিনি করুন, দুঃখ নাই। কিন্তু ওদের প্ররোচনায় আমাদের প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ ক'রে যেন তাঁর মহিমাকে খর্ব না করেন।

সবচেয়ে কাছে যারা থাকে, দেব-মন্দিরের সেই পাণ্ডারাই দেবতার সবচেয়ে বড় ভক্ত নয়।

আরো একটা কথা। যেটা সম্বন্ধে কবিগুরুর একটা খোলা কথা শুনতে চাই।

ওঁর আমাদের উদ্দেশ্য ক'রে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম ব'লে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি। এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ঐ দারিদ্র্য ব্যতীত হয়ত আর সব দুঃখের সাথেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পেলেও রাগ করিনি।

AMARBOI.COM

কি ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়—লক্ষ্মীর কৃপায় কবিগুরুর তা জানা নেই। ভগবান করুন, তাঁকে যেন জানতে না হয়। কবিগুরু কোনদিন আমাদের মত সাহিত্যিকের কুটীরে পদার্পণ করেননি—হয়ত তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ন হ'ত না তাতে—নৈলে দেখতে পেতেন, আমাদের জীবন-যাত্রার দৈন্য কত ভীষণ! এই দীন-মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন ক'রে। দেশে দেশে প্রোপাগাণ্ডা করা ত দূরের কথা, বাড়ী ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালিগুলোকে লুকাতে পারিনে। ভদ্র শিক্ষিতদের মাঝে ব'সে সর্বদাই মন খুঁতখুঁত করে, যেন কত বড় অপরাধ ক'রে ফেলেছি। বাইরের দৈন্য-অভাব যত ভিতরে ভিতরে চাবকাতে থাকে, তত মনটা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিগুরুর কাছেও শুধু ঐ দীনতার লজ্জাতেই যেতে পারিনে। ভয় হয়, এ-লক্ষ্মীছাড়া মূর্তি দেখে তাঁর দারোয়ানেরাই ঐ সুর-সভায় প্রবেশ করতে দেবে না।

দীন ভক্ত তীর্থযাত্রা করতে পারল না ব'লে দেবতা যদি অভিশাপ দেন, তা'হলে এই পোড়া-কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া কীই বা বলবার আছে!

তাঁর কাছে নিবেদন, তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুন, তা হয়ত সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত আপনার এই দারিদ্র্য-যন্ত্রণাকে উপহাস ক'রে যেন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দেন। শুধু ঐ নির্মমতাটাই সইবে না।

কবিগুরুর চরণে,—ভক্তের আর একটি সশ্রদ্ধ আবেদন—যদি আমাদের দোষত্রুটি হ'য়েই থাকে, গুরুর অধিকারে সস্নেহে তা দেখিয়ে দিন, আমরা শ্রদ্ধাবনত শিরে তাকে মেনে নিব। কিন্তু যারা শুধু কুৎসিৎ বিদ্রূপ আর গালিগালাজই করতে শিখেছে, তাঁকে তাদেরি বাহন হ'তে দেখলে আমাদের মাথা লজ্জায়, বেদনায় আপনি হেঁট হ'য়ে যায়। বিশ্বকবি-সম্রাটের আসন—রবিলোক—কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির বহু ঊর্ধ্বে।

কথাসাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র 'শনিবারের চিঠি'-ওয়ালাদের কাছে আমায় গালিই দিন আর যা-ই করুন, (জানি না এ সংবাদ সত্য কি-না) ঐ দারিদ্র্যটুকুর অসম্মান তিনি করতে পারেননি। অসহায় মানুষের দুঃখ-বেদনাকে তিনি এত বড় ক'রে দেখেছেন ব'লেই আজ তাঁর আসন রবিলোকের কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে।

একদিন কথা-শিল্পী সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম যে, শরৎচন্দ্র তাঁর বই-এর সমস্ত আয় দিয়ে 'পথের কুকুর'দের জন্য একটা মঠ তৈরী ক'রে যাবেন। খেতে না পেয়ে পথে-পথে ঘু'রে বেড়ায় যে-সব হন্যে কুকুর, তা'রা আহার ও বাসস্থান পাবে ঐ মঠে—ফ্রি অব চার্জ। শরৎচন্দ্র নাকি জানতে পেরেছেন, ঐ সমস্ত পথের কুকুর পূর্বজন্মে সাহিত্যিক ছিল, ম'রে কুকুর হয়েছে। শুনলাম ঐ মর্মে নাকি উইলও হ'য়ে গেছে!

ঐ গল্প শুনে আমি বারংবার শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বলেছিলাম, 'শরৎ-দা সত্যিই একজন মহাপুরুষ। সত্যিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা সাহিত্যিকরা কুকুরের জাত। কুকুরের মতই আমরা না খেয়ে এবং কামড়াকামড়ি ক'রে মরি। তাঁর সত্যিকার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে, তিনি সাহিত্যিকদের অবতার-রূপ দেখতে পেয়েছেন।'

আজ তাই একটি মাত্র প্রার্থনা,—যদি পরজন্ম থাকেই, তবে আর যেন এদেশে কবি হ'য়ে না জন্মাই। যদি আসি, বরং শরৎচন্দ্রের মঠের কুকুর হ'য়েই আসি যেন। নিশ্চিন্তে দু'মুঠো খেয়ে বাঁচব।

পৌষ ১৩৩৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীরবল

বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা

গত শনিবারের চিঠি খুলে দেখি যে, আমার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসা আছে। শ্রীযুক্ত বলাহক নন্দী লিখেছেন:[১]

'আমাদের লিখিত ভাষায় যে একটা বিপ্লব চলিতেছে তাহা ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কথিত ভাষায়ও যে এর চেয়ে অনেক বড় একটা বিপ্লব হইয়া গিয়াছে তাহা এই প্রথম শুনিলাম। বীরবল যখন এই পরিবর্তনের খবর রাখেন না (তিনি কি রিপ্‌ভ্যান উইঙ্কলের মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন?) তখন আর কাহার কাছে দাঁড়াই?'

এ প্রশ্নের প্রথম উত্তর—বাংলার গল্প-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপ নেই, সুতরাং তাদের কথিত ভাষাও যে কতদূর বীরবলী হয়ে পড়েছে তা আমাদের অবিদিত। দ্বিতীয় উত্তর—আমি বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরে সত্যসত্যই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কারণ সে মন্দিরে ইতিমধ্যে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, সপ্তরথী মিলে যে বঙ্গ-সাহিত্যের অভিমন্যুকে বধ করেছেন, ভীষ্ম যে এখন শরশয্যায় শয়ান, এসব কথা জেগে থাকলে আমি নিশ্চয় জানতে পেতুম। এসব ঘটনা যে ঘটেছে তার সন্ধান পেলুম আত্মশক্তিতে প্রকাশিত কাজী নজর-উল-ইস্‌লামের

---

১ [সেই যুগে নীরদচন্দ্র চৌধুরী 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় বলাহক নন্দী নামে লিখিতেন।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' নামক ট্রাজেডিতে। অবশ্য বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিমন্যু যে কে এবং সপ্তরথীরা যে কা'রা, তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু অভিমন্যু যিনিই হোন, তিনি যে মরেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ এই অপমৃত্যুর জন্য 'উত্তরা' শুনেছি তারস্বরে রোদন করছেন। কিন্তু তার জন্য ভীষ্মের উপর চারিধার থেকে যে কেন শরবর্ষণ হচ্ছে তার হদিস পাচ্ছিনে। অভিমন্যু-বধের পূর্বেই ত ভীষ্ম-বধ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রে যিনি শিশু-বধ করেছিলেন, তার নাম অশ্বত্থামা। সে মতিচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ যে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন তা ত জানিনে—আর যদি বা হয়েই থাকেন ত তাঁর অঙ্গে শরনিক্ষেপ করা বৃথা, কেননা সে পাপ অমর।

সে যাই হোক, আমি জেগে থাকলেও এ খুনোখুনির ব্যাপারে যোগ দিতুম না, কারণ আমি জানি, আমার হাতে আল্‌পিনের চাইতে বেশী মারাত্মক অস্ত্র নেই। তবে এই সূত্রে কাজী সাহেব এমন একটি তর্ক তুলেছেন যে তর্কে যোগদান করবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারছিনে—কারণ সে তর্ক হচ্ছে ভাষার তর্ক, আর বৃথা ভাষার তর্ক ক'রেই আমার জীবনটা বৃথায় গেল। কাজী সাহেব বলেছেন যে, 'কবিগুরু বলেছেন আমি কথায় কথায় রক্তকে খুন ব'লে অপরাধ করেছি।'

কবিগুরু হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যে কাজী সাহেবকে লক্ষ্য ক'রে একথা বলেছেন,—এ সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়নি, যদিচ যে-সভায় তিনি ও-কথা বলেন সে-সভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, কোনও উদীয়মান তরুণ কবির নবীন ভাষার উদাহরণ-স্বরূপ তিনি 'খুনের' কথা বলেন। কোনও উদিত কবির প্রতি তিনি কটাক্ষ করেননি।

২

সাহিত্য-জগতে তরুণ বলতে কাকে বোঝায়, তার সন্ধান আমি আজও পেলুম না। যদি আমি ও-পদবাচ্য না হই তা হ'লে কাজী সাহেবও তা নন্। কারণ, সাহিত্যিক ঠিকুজি অনুসারে আমার বয়স ষোল—আর কাজী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবের দশ। সাহিত্যিকরা ত আর বিয়ের কনে নন যে, দশে ও ষোলয় বেশী তফাৎ করে। গত পরশ্ব একটি সারস্বত সমাজে আমাকে কেউ কেউ প্রবীণ সাহিত্যিক ব'লে আর পাঁচজনের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলেন, আমি যদি প্রবীণ হই তা হ'লে কাজী সাহেব কি ক'রে নবীন হন? এক্ষেত্রে নবীনে-প্রবীণে কি এত কম ব্যবধান? সত্য কথা এই যে, এক্ষেত্রে কোনই প্রভেদ নেই। যে নবীন-সাহিত্যিক প্রবীণ নন—তিনিও তদ্রূপ সাহিত্যিক, যে প্রবীণ-সাহিত্যিক নবীন নন তিনি যদ্রূপ সাহিত্যিক। সাহিত্য হচ্ছে চির-নবীন ও চির-পুরাতন, সাহিত্যিকরাও তাই। সরস্বতীর নকরি গভর্ণমেণ্টের চাকরি নয় যে আপিসে senior-junior-এর কোনও অর্থের প্রভেদ আছে। কার কত বয়স সে খোঁজ সরস্বতী রাখেন না।

৩

বাংলা কবিতায় যে 'খুন' চলছে তা, এমন কথা আর যেই বলুন রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না, কারণ, কাজী সাহেব এ পৃথিবীতে আসবার বহু পূর্বে নাবালক ওরফে বালক রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মিকী-প্রতিভা' নামক যে কাব্য রচনা করেছিলেন, তার পাতা উল্টে গেলে 'খুনে'র সাক্ষাৎ পাবেন। কিন্তু এসব খুন এত বেমালুম খুন যে, হঠাৎ তা কারও চোখে পড়ে না।

তার পর কাজী সাহেব এই ব'লে দুঃখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার অন্তরে আরবী-ফার্সি শব্দের প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করতে চান। কাজী সাহেবের এ বিলাপ প্রলাপ মাত্র। কেননা, যদি তাঁর ও-রকম কোনও কুমতলব থাক্‌ত তা'হলে তিনি বহু পূর্বে আমার ভাষার উপর খড়্গহস্ত হতেন। বীরবলী ভাষা যে সাহিত্যে একঘরে, এমনকি সংবাদপত্রে ও আর পাঁচজনের ভাষার সঙ্গে এক পংক্তিতে তা বসতে পারে না, তার প্রধান কারণ যে সে ভাষা শব্দ সম্বন্ধে untouchability মানে না।

বীরবলী ভাষা চলে শুধু বীরবলের সইয়ের উপর, অর্থাৎ স্বনামে, অনামে নয়। বীরবল সাহিত্য-সমাজে শুধু 'আমি' বলতে পারেন, 'আমরা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলবার তাঁর অধিকার নেই, গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করবার অধিকারে তিনি বঞ্চিত। যাক্ সেসব কথা। বাংলা সাহিত্য থেকে আরবী ও ফার্সি শব্দ বহিষ্কৃত করতে সেই জাতীয় সাহিত্যিকরাই উৎসুক যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন না। আর রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা ভাষা জানেন না এমন কথা বোধ হয় কোনও অকরুণ তরুণ সাহিত্যিকও বলতে চান না। আরবী-ফার্সি শব্দ যদি ত্যাগ করতে হয়, তা'হলে আমাদের সর্বাগ্রে 'কলম' ছাড়তে হয়। কারণ ও-শব্দটি শুধু আরবী নয়, এমন অনির্বচনীয় আরবী যে ও-শব্দ হাঁ ক'রে কণ্ঠমূল থেকে উদ্‌গিরণ করতে হয়। ও 'ক' হিন্দু জবানে বেরয় না এক কাশি ছাড়া। এই সূত্রে কাজী সাহেব আমাদের বেশের উপর মুসলমান বেশের প্রভাবের কথা যা বলেছেন তা সবই সত্য, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক। আমাদের বেশের অনুরূপ সরস্বতীর বেশে গোঁজামিল দিলে তাঁর শ্রীবৃদ্ধি হয় না। আমরা হ্যাট-কোটও পরি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার অভিন্নহৃদয় সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী যখন কবিতা লিখতে গিয়ে, মিলের খাতিরে লিখে বসলেন, 'সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট'—তখন দেশ-শুদ্ধ লোকে হেসে উঠেছিল। সুতরাং সরস্বতী যদি এখন চুড়িদার পায়জামা পরে, গায়ে কাবা ও মাথায় শেরওয়ানি টুপি চড়িয়ে হাতে রুমাল ঘোরাতে ঘোরাতে রাজপথে দেখা দেন, তা'হলে সকলে একবাক্যে ব'লে উঠবেন—'ওঁকে বোরখা পরাও, বোরখা পরাও।' এ হচ্ছে যুক্তির কথা নয়, রুচির কথা।

'কথায় কথায় রক্তকে খুন বলাটা' যে সাহিত্যিক অপরাধ, তার কারণ, কথায় কথায় খুনকে রক্ত বলাটাও সমান অপরাধ। অদ্যাবধি ফৌজদারী আদালতে কোনও উকিলই 'রক্তের মামলা' করেননি, কারণ অদ্যাবধি কোনও বাঙ্গালী 'রক্তের আসামী' হয়নি। অশ্বত্থামার মত যাঁর মাথায় খুন চড়ে যায়, তাঁকেও রক্তের দায়ে কোন বিচারালয়ই ফেলতে পারে না। এর কারণও স্পষ্ট। কথায় বলে, 'যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি।' কথা সত্য, কিন্তু তাই ব'লে বঙ্গ-সাহিত্যে মুড়ি ও চাল-ভাজার অদ্বৈতবাদ অচল। ন্যায়সঙ্গত খুন ও রক্তেরও অদ্বৈতবাদ অচল। মা-কালীর খুনে অরুচি নেই, তাই ব'লে শ্রীমান দিলীপ কুমার যদি ভক্তিভরে তাঁর সুমুখে গান ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে—'কে দিয়েছে খুন জবা পায়', তা'হলে লট্ট লট্ট বেশিনী তন্মুহূর্তে অট্ট অট্ট হাসিনী হয়ে উঠবেন।

অভিধানে খুন আর রক্ত এক হতে পারে, কিন্তু ব্যাকরণে তা নয়। রক্তও বিশেষ্য, খুনও তাই। কিন্তু রক্ত উপরন্তু বিশেষণ, খুন তা নয়। অপরপক্ষে খুন ক্রিয়া, রক্ত তা নয়। আর আমরা যাকে 'পদ' বলি, তার দুকুল আছে, এক অভিধান-কুল আর এক ব্যাকরণ-কুল। শব্দের এই দুকুল রক্ষা ক'রে ব্যবহার করাই সাহিত্যের ধর্ম।

সর্বশেষে খুনের একটি গুণের উল্লেখ করব—যেটি রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেননি। কবিতা লিখতে হ'লে মিলের প্রয়োজন—অন্ততঃ বাংলা কবিতাতে ত তাই। এখন বাংলা ভাষায় খুনের যত মিল খুঁজে পাওয়া যায়, রক্তের তার শতাংশের একাংশও পাওয়া যায় না। ক চ ট ত প বর্গের ভিতর ভক্ত শুধু রক্তের সঙ্গে মেলে, তারপর শক্ত। বাস্, ওইখানেই খতম্। অপর পক্ষে খুনের মিলের আর অন্ত নেই। পঞ্চবর্গের প্রায় অক্ষরে খুনের মিল পাওয়া যায়; পুথি বেড়ে যায়, এই ভয়ে তার আর ফর্দ দিলুম না। আপনারা এই সব অক্ষরের গায়ে 'উন' চড়িয়ে দেখবেন মেলে কি না মেলে। এমন কি বর্ণমালার শেষ অক্ষরজাত হুনের সঙ্গে খুনের সম্বন্ধ অতি নিকট। অতএব কবিতায় যদি খুন বাদ দিতে হয় তা'হলে reason-এর খাতিরে rhyme-কে তালাক দিতে হয়। আর কে না জানে rhyme-এর খাতিরে reason-এর সাত খুন মাপ।

মাঘ ১৩৩৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী নজরুল ইসলাম

আমার কৈফিয়ৎ

(১)

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি'।
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি!
কেহ বলে, তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে!
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে বাণী কই কবি?
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী!

(২)

কবি-বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা প'ড়ে শ্বাস ফেলে'!
বলে, কেজো ক্রমে হচ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাশ ঠেলে'।
পড়ে না'ক বই, বয়ে গেছে ওটা!
কেহ বলে বৌ-এ গিলিয়াছে গোটা!
কেহ বলে, মাটি হ'ল হয়ে মোটা জেলে ব'সে শুধু তাস খেলে'!
কেহ বলে, 'তুই জেলে ছিলি ভালো, ফের যেন তুই যাস্ জেলে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৩)

গুরু কন, তুই করেছিস গুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা!
প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, 'তুমি হাঁড়িচাঁচা!'
আমি বলি, প্রিয়ে হাটে ভাঙি হাঁড়ি!
অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি!
সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা কন, 'আড়ি চাচা।'
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি নাড়ি কাছা!

(৪)

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্-লা'রা কন হাত নেড়ে',
'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জা'ত মেরে'!
ফতোয়া দিলাম—কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও!
'আমপারা'-পড়া হাম্বড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে'!'
হিন্দুরা ভাবে, পার্শী শব্দে কবিতা লেখে, ও পা'ত-নেড়ে!

(৫)

আন্‌কোরা যত নন্‌ভায়োলেন্ট্ নন্-কো'র দলও নন্ খুশী।
'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন্' নাকি আমি বিপ্লবী-মন তুষি!
'এটা অহিংস' বিপ্লবী ভাবে,
'নয় চর্‌কার গান কেন গাবে?'
গোঁড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতি-রাম ভাবে কন্‌ফুসি!
স্বরাজীরা ভাবে নারাজী, নারাজী ভাবে তাহাদের অঙ্কুশি!

(৬)

নর ভাবে, আমি বড় নারী-ঘেঁষা! নারী ভাবে, নারী-বিদ্বেষী!
'বিলেত ফেরনি?' প্রবাসী-বন্ধু ক'ন, 'এই তব বিদ্যে ছি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভক্তরা বলে, 'নবযুগ-রবি'!—
যুগের না হই হুজুগের কবি
বটি ত রে দাদা, আমি মনে ভাবি, আর ক'ষে কষি হৃদ্-পেশী।
দু'কানে চশ্‌মা আঁটিয়া ঘুমানু, দিব্যি হ'তেছে নিঁদ বেশী!

(৭)

কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু আমিই কি বুঝি তার কিছু?
হাত উঁচু আর হ'ল না ত ভাই, তাই লিখি ক'রে ঘাড় নীচু!
বন্ধু! তোমরা দিলে না ক' দাম,
রাজ-সরকার রেখেছেন নাম!
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন! আর কিছু
শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু?

(৮)

বন্ধু! তুমি ত দেখেছ আমায় আমার মনের মন্দিরে।
হাড় কালি হ'ল, শাসাতে নারিনু তবু পোড়া মন-বন্দীরে!
যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল,
মেরে মেরে তা'রে করিনু বিকল,
তবু যদি কথা শোনে সে পাগল! মানিল না রবি গন্ধীরে।
হঠাৎ জাগিয়া বাঘ খুঁজে ফেরে নিশার আঁধারে বন চিরে'!

(৯)

আমি বলি, ওরে কথা শোন্ ক্ষ্যাপা, দিব্যি আছিস খোশ্-হালে!
প্রায় 'হাফ'-নেতা হ'য়ে উঠেছিস, এবার এ দাঁও ফসকালে
'ফুল'-নেতা আর হবিনে যে, হায়!—
বক্তৃতা দিয়া কাঁদিতে সভায়
গুঁড়ায়ে লঙ্কা পকেটেতে বোকা এই বেলা ঢোকা! সেই তালে
নিস্ তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে', নয় পস্তাবি শেষকালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১০)

বোঝে না'ক যে সে চারণের বেশে ফেরে দেশে দেশে গান গেয়ে,
গান শুনে সবে ভাবে, ভাবনা কি? দিন যাবে এবে পান খেয়ে!
র'বে না'ক ম্যালেরিয়া মহামারী,
স্বরাজ আসিছে চ'ড়ে জুড়ি-গাড়ী,
চাঁদা চাই, তা'রা ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়, কাঁদে ছেলে-মেয়ে।
মাতা কয়, ওরে চুপ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে, দেখ চেয়ে।

(১১)

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দু'টো ভাত একটু নুন।
বেলা ব'য়ে যায়, খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন!
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে না'ক তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?

AMARBOI.COM

(১২)

আমরা ত জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস!
কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস
এল কোটি টাকা, এল না স্বরাজ!
টাকা দিতে নারে ভুখারি সমাজ।
মা'র বুক হ'তে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ খাও হে ঘাস!
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ!

(১৩)

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না'ক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

(১৪)

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!

আশ্বিন ১৩৩২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনা পরিচয়

উৎসর্গ কবিতা: Charles Baudelaire, 'Le Miroir,' *Oeuvres complètes,* vol. 1, red. Claude Pichois (Paris: Gallimard, 1975), p. 344; রচনা: ১৮৬৪, তর্জমা: ২০২১।

ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়

১ 'ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়,' পূর্বে অপ্রকাশিত।

২ 'ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা: রবীন্দ্রনাথের সাধনা,' আদি সংস্করণ: 'বাঙ্গালাভাষায় রক্তের ব্যবসায়,' *পাক্ষিক অন্যদিন*, ঈদ সংখ্যা ২০১১, পৃ. ৬৩৭-৫২; পরিমার্জিত সংস্করণ: 'ভাষা, বিষয়, সমাজ: রবীন্দ্রনাথের সাধনা,' *তর্ক*, বর্ষ ২, সংখ্যা ১ (অক্টোবর ২০২২), পৃ. ১২৭-৬১।

৩ 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা,' লিখিত বক্তৃতা পাঠ: ২২ ডিসেম্বর ২০১৮, জোড়াসাঁকো, কলকাতা, কর্মশালা: 'কবিতা পড়া, কবিতা লেখা,' আয়োজক: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র' ও 'অগ্রবীজ' পত্রিকা; প্রথম প্রকাশ: 'মহিমার অবসান: নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা,' *অগ্রবীজ*, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ১ (মে ২০২২), পৃ. ৯৩-১০৪।

৪ 'জাতির নামে বজ্জাতি,' *পাক্ষিক অন্যদিন*, ঈদ সংখ্যা ২০১৫, পৃ. ২০৯-১৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবর্ধনা

ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবির অভিভাষণ,' *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১২শ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২২), পৃ. ৫০৭-১১; ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ তারিখে প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদ সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সংবর্ধনার উত্তরে প্রদত্ত মৌখিক অভিভাষণের কবিকৃত অনুলেখন; প্রথম প্রকাশ: *প্রবাসী*, ফাল্গুন ১৩৩৪।

খ কাজী নজরুল ইসলাম, 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ,' *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭), পৃ. ৬২২-৩০; প্রথম প্রকাশ: *আত্মশক্তি*, বর্ষ ২, সংখ্যা ৩৭ (১৪ পৌষ ১৩৩৪)।

গ প্রমথ চৌধুরী, 'বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা,' কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭), পৃ. ৬৫৮-৬০; প্রথম প্রকাশ: *আত্মশক্তি*, বর্ষ ২, সংখ্যা ৪২ (২০ মাঘ ১৩৩৪)।

ঘ কাজী নজরুল ইসলাম, 'আমার কৈফিয়ৎ,' *নজরুল-রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭), পৃ. ৪১-৪৪; প্রথম প্রকাশ: *বিজলী*, বর্ষ ৫, সংখ্যা ৪১ (আশ্বিন ১৩৩২)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯ নির্দেশিকা ৫

নামভুক্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির ভিন্নতা রক্ষা করা হইয়াছে। কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

১৯৪৭ (১৪)-(১৫), (১৯)-(২১), ১০-১১, ৮০-৮১, ৮৬
    আরো দেখুন, দেশভাগ, বঙ্গের দ্বিতীয় বিভাজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৯, ৩২, ৫১
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৯
অমর কাব্য ৭, ৬০
অরুণকুমার বসু ৩২
অসহযোগ আন্দোলন (১৭), (২২), ৭৪-৭৬

'আত্মশক্তি' (১৪)-(১৬), ২৮, ৩০, ৩৩, ১১৪
আধুনিক,
    বাংলা কবিতা (২৩), ৭৮
    সাহিত্য ২১, ২৩, ২৫, ২৯, ৬৩
আবদুল আজীজ আল-আমান ৩২
আবদুল কাদির (১২), (১৫)-(১৬), (২৩)-(২৪)
আবুল কাসেম ফজলুল হক (২১), ৮৯
আবুল মনসুর আহমদ ৮২
'আমার কৈফিয়ৎ' (২৩), ৪-৫, ৮, ৭৮, ১১৯-২৩
আরবি ৫১, ৫৪, ৬০, ৬২, ১১৭
    আরবি-ফারসি ৫, ৪৮-৫৪, ৫৬, ৬২-৬৪, ১০৮-১০, ১১৬-১৭
    আরবিয়ানা-পারসিয়ানা ৫৫
    আরো দেখুন, ফারসি
আরস্তু লেনিন খান (১২)
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৪
আহমদ ছফা (১২), (১৯), ৮৭-৯০
'আহমদ ছফা সঞ্জীবনী' (১১), (১৩)

ইটালি ৪৯, ১০৮

উর্দু ৩৭, ৫৪, ৫৮, ৮২

এ কে ফজলুল হক; *দেখুন*, আবুল কাসেম ফজলুল হক
এয়ুরোপ (য়ুরোপ) (১৬), ৩, ২১, ২৩-২৪, ৪৩, ৪৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এয়ুরোপীয় আর্টিস্ট ৪৫, ৯৮
এয়ুরোপীয় সাহিত্য ২২-২৪, ৪৩, ৪৬

কলিকাতা (১৭), ৮৫, ৮৭, ৮৯
কলিকাতার যুগ ১৩
কল্লোল গোষ্ঠী (১৫), ১৬
কল্লোল যুগ ১৭-১৯
'কাজির বিচার' (১১), (১৩)
কাজী আবদুল ওদুদ (১৪), (২৩), ১৮-২০, ২৩-২৪, ৬৮-৭৪, ৭৬, ৭৮
'ব্যবহারিক শব্দকোষ' (১৪)
'কাণ্ডারী হুশিয়ার!' (২২)
কামরুল হাসান মেনন (১২)
'কালি-কলম' (১৫), (২২)
কিটস, জন,
'হাইপেরিয়ন' ৫৬
কৃষক প্রজা পার্টি (২১)
'কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মিলনী' (২২)
কেশবচন্দ্র সেন ১০০
'কোরবাণী' ৭৩

খলিফা (তুর্কি সম্রাট) (১৬)-(১৭)
খেলাফত,
আন্দোলন (১৭), (২২), ৭৩
আন্দোলনের প্রতিনিধি ৬৮
যুগ (২২), ৭৩

গোকুল নাগ ১৯
গোলাম মকসুদ হিলালী,
'বাংলায় আরবি-ফারসি উপাদান' ৬৩
গোলাম মোস্তফা ৮১-৮৫

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৭), ৩-৪
চিরকেলে বাণী ৪, ৬-৭, ৬০
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (২০), ৭৬

জয়া চট্টোপাধ্যায় (১৪), (২০)-(২১)
জসীম উদ্‌দীন (১২), ৭৬-৭৭, ৮১-৮২
'জাতীয় কবি' উপাধি ৮০, ৮৪, ৮৭-৮৯
জালিয়ানওয়ালাবাগ (১৬)
জিয়াউর রহমান ৮৭-৮৮
জীবনানন্দ দাশ ১৯, ৩২
জোতদার (২০)-(২১)
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস,
'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' ১০

ঢাকা ৮১, ৮৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৮০, ৮৭

তুষার হাসান মাহমুদ (১২)

দন কিহোতে ৭০
দিলীপ কুমার ১১৭
দিল্লি (১৮)
দেশভাগ (১৪), (২০)-(২১)
আরো দেখুন, ১৯৪৭, বঙ্গের দ্বিতীয় বিভাজন
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৩

ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (১৩)

'নজরুল-রচনাবলী' (১৫)-(১৬), (২৪), ৬
'নজরুল রচনা-সম্ভার' (১৫), (২৪)

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (২৩)
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
'সাহিত্যধর্মের সীমানা' (১৫)
নামান্তর; *দেখুন*, লক্ষণা
নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি (২১)
নীরদচন্দ্র চৌধুরী (বলাহক নন্দী) ১১৪

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬
পাঞ্জাব (১৬), (১৮)
পারসী; *দেখুন*, ফারসি
পার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৯)-(২০), ১১
'বঙ্গের দ্বিতীয় বিভাজন' ১১
পার্থসারথি গুপ্ত (১৪)
পুনা সন্ধি (২১)
'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ৬৩-৬৪
প্রথম মহাসমর (১৬), ২০
'প্রবাসী' (১৫), (১৭), ৩০-৩১, ৩৪, ৩৮, ৫২, ৫৪
প্রমথ চৌধুরী (১২), (১৬), (২২)-(২৩), ৩৩-৩৫, ৪৮-৫২, ৫৯, ৬৩
'বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা' (১৬), (২৩), ৩৩, ৪৮, ১১৪-১৮
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় (১৫)
প্রীতিকুমার মিত্র ৩২
প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯, ৩৫
প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৬)-(১৭), (২২), ২৭-২৮, ৪৩, ৯৫
রবীন্দ্র-পরিষদ (১৬), (২২)-(২৩), ২৭, ৩১, ৪৩, ৯৫, ৯৯

ফররুখ আহমদ ৮৩-৮৪
ফরাশি শাসন ৫৭
ফারসি (ফার্সি, পারসী) ৫, ৩৭, ৫৪, ৫৬-৫৮, ৬০-৬২
আরো দেখুন, আরবি
ফ্যাসিপন্থী রাজনীতি ৭
ফ্যাসিবাদ ৪৮
ফ্যাসিস্ট মতাদর্শ ৬-৭

'বঙ্গবাণী' (১৫), (২২)
বঙ্গভঙ্গ (১৯)
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস (২০), (২২)
বঙ্গের দ্বিতীয় বিভাজন (বিভাগ) (১৯), (২২), ১০-১১, ৫৪
আরো দেখুন, ১৯৪৭, দেশভাগ, বঙ্গভঙ্গ
'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' (১৩)-(১৬), ৯, ৩৩, ৫৩, ১০৩-১৩, ১১৫
'বলাকা' ৬৯-৭০
বলাহক নন্দী; *দেখুন*, নীরদচন্দ্র চৌধুরী
'বসন্ত' (১৫), ১০৩
বাংলা একাডেমি (২৪)
বাংলার দ্বিতীয় বিভাজন; দেখুন, বঙ্গের দ্বিতীয় বিভাজন
বাঙালি ১০, ৪০-৪১, ৫৫, ৬৬, ৭১, ৮৮
কবি ৯, ১৪, ৩১
মুসলমান (২০), ৩৭-৩৯, ৪১, ৭৮, ৮১, ৮৩-৮৪, ৮৬, ৮৯
হিন্দু ৩৮-৩৯
কবি ৯, ৩১, ৩৩, ১০১
'বাঙ্গলার কথা' (১২), (১৬), ২৭-২৮, ৩১, ৩৫, ১০৭
'বাল্মিকী-প্রতিভা' ৪৯, ১১৬
'বিচিত্রা' (১৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বিদ্রোহী' ১৫, ১৯, ৬৮, ৭০, ৭২-৭৪
বিশ্বভারতী ৩
বিহার (১৮)
বুদ্ধদেব বসু ১৪-১৯, ২৭, ৭০
'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' ১৪
বেনিয়ামিন, বাল্টার ৬-৭, ৪৫, ৪৮, ৭৮-৭৯
বোদলেয়ার, শার্ল (৭৯)
বোম্বে (১৮), ৬৪
ব্রজদুর্লভ হাজরা ৩০
ব্রিটিশ শাসন / দখলদারি, ১৩, ৬৪
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ (১৬), ৮৬
ব্রিটিশশাসিত ভারত (১৮), ৮১, ৮৬, ৮৯

'ভদ্রলোক' (১৪), ১৬
শ্রেণি / সম্প্রদায় (১৭), (১৯), (২০)-(২১)
ভারতচন্দ্র ২৫, ৪৮, ১০৮
'ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা' ৭৭

'মডার্ন রিবিয়ু' (১৭)
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১০৪
মদনমোহন তর্কালংকার ২৫
মদনমোহন মালবিয়া ১০৯
'ময়মনসিংহ গীতিকা' ৬৩-৬৪
মহিমা (অরা) ৭৮
মাৎস্যন্যায় (১৩)-(১৪), ৯-১১, ৬২
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২১)
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ (২৪)
মুহম্মদ ইকবাল ৮৩-৮৪
মেহেদী হাসান (১২)
মোস্তফা কামাল (১৭)
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি (১৭), ৬, ৭৫
'মোহর্‌রম' (২২), ৭৩
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ৮৬
মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম (১২)
মোহিতলাল মজুমদার (১৫), (২৩), ১৬, ২৪-২৭
'আধুনিক সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র' (১৫)

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৬
যদুনাথ সরকার ১০
'বাংলার ইতিহাস' ১০
যুক্ত প্রদেশ (১৮), ৬৪

য়ুরোপ; দেখুন, এয়ুরোপ

রঞ্জতকান্ত রায় (২০)
রত্নলেখা রায় (২০)
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৬
রফিকুল ইসলাম ৩২, ৫২
'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (১২), ৩১, ৩৪
রাওলাট আইন (১৬)
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৭), ৪-৫
রূপক (রূপান্তর) ৫৮, ৬০-৬১
রেনেসাঁস (২২)

লক্ষণা (নামান্তর) ৫৮, ৬০-৬১

'শনিবারের চিঠি' (১৭), ৫, ২৭-২৮, ৩০-৩১, ৩৫-৩৬, ১১২, ১১৪
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫), (২১), (২৩), ৩০-৩১, ৫৪, ১১২-১৩
'সাহিত্যের রীতিনীতি' (১৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামস-উদ-দিন মোহাম্মদ হাফিজ ৫৬, ৭৩
শিবু কুমার শীল (১২)
'শেষের কবিতা' ২০
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৪

সজনীকান্ত দাস ৩৫
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৪, ১৬-১৭, ৪৮, ৭৩, ১০৮
'সভ্যতার সংকট' ১০
সাম্প্রদায়িক (১৮)-(১৯), ৩৯-৪০, ৮৮-৮৯
  দাঙ্গা (১৭)-(১৮), ৬৪
  দুর্যোগ / হানাহানি (২২), ৬০
  বাঁটোয়ারা (১৯), (২১), ৫৪
  ভাবাদর্শ / রাজনীতি (২০), ৬১
  ভেদবুদ্ধি ৯০
সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (২১)
সাম্প্রদায়িকতা (২০)-(২১), ৪৭, ৫৪, ৮৬
  ভাষা ৪৭
  সাহিত্যে ৮৫
'সাহিত্যধর্ম' (১৫), ২০, ৪৮
'সাহিত্যসম্মিলন' ৩৭
'সাহিত্যে নবত্ব' (১৫), ২৩-২৪, ২৮, ৪৩, ৪৮
সুকুমার সেন ৬২, ৬৪
সুগত বসু (২০)
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৬২
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৮
সুমন আরেফিন (১২)
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪)
সুমিতা চক্রবর্তী (১২), (২৩), ৯, ৩৩-৩৯, ৪৩, ৪৭-৪৮, ৬৫
সুরাইয়া জান্নাত (১২)
সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১১২
সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ২৭, ৯৫
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪
  'এ নেশন ইন মেকিং' (১৮)
সৃজনশীলতা ৭৮
  পারত্রিক ৬০
সৈকত দে (১২)
সৈয়দ আলাওল ৮৫
সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন ৮১, ৮৬, ৮৮-৯১
  'বাংলার কথা' ৮১, ৮৮
সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ৮৫-৮৬
স্বদেশি আন্দোলন (১৯), (২২), ৭৩, ৭৫-৭৬

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' ৯
হরেন্দ্র চন্দ্র পাল ৬৩
  'বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ' ৬৩
হিন্দি ৪১, ৫৮
হিন্দু ভদ্রলোক; *দেখুন*, 'ভদ্রলোক'
হিন্দু মহাসভা (২০)
হিন্দু-মুসলমান (১৭), (২৩), ৫৫, ৬০, ৬২, ৬৪, ৭২, ৮৩-৮৪
  ঐক্য / মিলন (১৭), (২২), ৮৩
  বিরোধ / হানাহানি (১৭), ৯০
  সম্পর্ক ৩
হুমায়ুন কবির (১২), (২২), ১৮, ৭৪-৭৮
  'বাঙলার কাব্য' (২২)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

Phalgun 1429 • February 2023

Salimullah Khan

Thakurer Matsyanyaya: Bhasha-Shikshay Sampradayikata

Jatiya Sahitya, Vol. III

Published by Modhupok

Bulbul Nikunja, 34/4 Ahmedbag, Basabo, Dhaka 1214

modhupok@yahoo.com • www.modhupok.com

/ BeeEdited

Price: Tk 450

PRINTED IN BANGLADESH

ISBN: 978 984 94233 3 1

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধুপাক

কয়েকটি প্রকাশনা

সলিমুল্লাহ খান
উৎসর্গ: পরিবার প্রজাতি রাষ্ট্র
ইতিহাস কারখানা, ৪র্থ খণ্ড
২০২৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
ক্ষমা নেই
মেহেদী হাসান সম্পাদিত
সুবর্ণজয়ন্তী সংস্করণ, ২০২২

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি
চলচ্চিত্র শিল্প জাতীয়করণ নীতিমালা ১৯৭১
মীর শামছুল আলম বাবু সম্পাদিত
২০২১

পেন্টি সারিকস্কি
উহারা বাতাসে: কবিতা ১৯৫৮-১৯৮০
সলিমুল্লাহ খান অনূদিত
২০২১

আলমগীর কবির
শুনছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ১৯৭১
রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড
২০২০

সলিমুল্লাহ খান
প্রার্থনা
জাতীয় সাহিত্য, ২য় খণ্ড
২০১৯

Jasim Uddin
The Field of the Embroidered Quilt
Translated by E M Milford
5th edition, 2018

আলমগীর কবির
চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি
রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড
২০১৮

আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান
অনূদিত
বুদ্ধের হৃদয়
২০১৭

সলিমুল্লাহ খান সম্পাদিত
গরিবের রবীন্দ্রনাথ
আহমদ ছফা স্মৃতি, ১ম খণ্ড
২০১৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~